বাংলাপিডিএফ.নেট

শুভম

এক যুবকের ছায়াপথ

সৈয়দ শামসুল হক

আকাশ

একযুবকের ছায়াপথ

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শু
ভ
ম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

প্রকাশক
মজিবর রহমান খোকা
বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৮৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
কাজী হাসান হাবীব

প্রচ্ছদ মুদ্রক
জি এ ফারুক
প্রকাশ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং
৩৩/১ সোনারগাঁওরোড ঢাকা

[স্বত্ব] গ্রন্থকার

মুদ্রক
সরকার কবির উদ্দিন
বর্ণক মুদ্রায়ণ
২৪ শ্রীশদাস লেন ঢাকা

দাম
চল্লিশ টাকা

এক যুবকের ছায়াপথ

সৈয়দ শামসুল হক

স্ক্যানের জন্য বইটি দিয়েছেন

গোলাম মাওলা আকাশ

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট

(fb.com/groups/Banglapdf.net)

বইপোকাদের আড্ডাখানা, Book lovers club (বইপ্রেমীদের আড্ডাখানা)
বই এবং আড্ডা, বইয়ের স্বর্গ (Book's Heaven), বুক'স আর্কাইভ বিডি
এর সৌজন্যে নির্মিত

WEBSITE:

WWW.BANGLAPDF.NET

উৎসর্গ

আনিস চৌধুরী

১

আজ মিঠুয়ার গায়ে হলুদ, বিয়ে পরশুদিন। এই বিয়ের জন্যে কি কান্ডটাই না করল মিঠুয়া। সেসব বলতে গেলে একখানা কেসসা হয়ে যায়। থাক। কথা প্রসঙ্গে যতটুকু আসে।

মিঠুয়া আমাকে ডাক দিল। বাইরে যাচ্ছিলাম। একটু পরেই ওর বান্ধবীরা আসবে, তারপরে গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে এক পাল মেয়েরা। এর ভেতরে থাকবার ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। একেবারে রাত করে ফিরব সেই মন নিয়ে বেরুচ্ছি, পেছন থেকে ডাক।

'মামা।'

শুনতে পাইনি ভান করে বেরিয়ে যাব ভাবছি, হঠাৎ মনে পড়ল আর দুটো দিন, আক্ষরিক অর্থে আর মাত্র দুটো দিন পরে মেয়েটা বাড়ি থেকে চিরদিনের মতো চলে যাবে। ফিরে দাঁড়ালাম।

'কি রে?'

'মামা, শোনো এদিকে।'

মিঠুয়া ঐ রকমই। সব কথাই তার গোপন কথার মতো করে বলা চাই। হাত নেড়ে কাছে ডাকবে, কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করবে। আসলে কিছু না।

'মামা, মাকে একটু বোঝাও তো।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'মা থাকবে না।'

'থাকবে না মানে?'

আমি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে মিঠুয়ার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। মিঠুয়ার মুখখানা হঠাৎ অপরিচিত মনে হয়। মিঠুয়া আমার ভাগনি বলে আর ধারণা হয় না। একটি মেয়ের মতো তার সবকিছু এসে আমার চোখে চাপড় মারে।

'থাকবে না মানেটা কি ?'

'ওরা গায়ে হলুদ আনবে, ওদের বাড়ির মেয়েরা।'

তবু আমি কিছু কিনারা পাই না।

'মা ঘরে গিয়ে শুয়ে আছে। বলছে, সে বেরুতে পারবে না।'

আমি গম্ভীর গলায় বলি, 'দ্যাখ, মিঠু, মাকে তুই সে-সে বলতে পারিস না। তিনি গুরুজন। এখন বিয়ে হচ্ছে, এখনো অসভ্যতা ভালো নয়। তোর মা যদি না বেরোন, কুটমের সাথে দেখা না করে আমি কিছু করতে পারি না।'

মিঠুয়া তখন 'মামা' বলে আমার হাত ধরে টান দেয়।

'প্লিজ, মামা, কেলেংকারী হয়ে যাবে। আমি মুখ দেখাতে পারব না। সারাজীবন আমাকে খোঁটা দেবে। প্লিজ, তুমি, মাকে, প্লিজ মামা।'

যেভাবে মিঠুয়া ঘ্যানঘ্যান করে ওঠে তাকে আবার সেই পাঁচ বছরের বাচ্চার মতো মনে হয়। আমার তখন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা, মিঠুয়া আমার কোলে উঠে ভূতের গল্প শোনার জন্যে ঝুল ধরত। আমার একেক সময় মনে হয়, বড়বু যদি তার মেয়েটিকে সারাটা দিন আমার ঘাড়ে চাপিয়ে না রাখতেন, তাহলে হয়ত পরীক্ষায় আমি আরো ভালো করতে পারতাম। বলতে গেলে মিঠুয়া আমার হাতেই মানুষ। ওর মা তো তার মরা স্বামীর চিন্তায় আজ পনেরো বছর, এখনো সেরে উঠল না। মিঠুয়াকে দেখতে পারত ছোটবু, কিন্তু তার মন পড়ে থাকত সিনেমার কাগজে। সময় কোথায় ? ছোটবু'র ধারণা ছিল, চান্স পেলে দারুণ হিরোইন হতে পারবে সে। সাহস করে কোনো প্রডিউসারের কাছে যাওয়াই হলো না তার। মাঝখান থেকে বিয়ে করে বসল। খুব যে একটা নিজের ইচ্ছেয়, তা নয়। বিয়েটা এসে গেল আর কি। আর আমাদের মা তো বড় ভাইয়ের একসঙ্গেই চলে যান। বাড়িতে আর মেয়ে কই ? মহিলা কই যে মিঠুয়াকে দেখবে ? তাই বলছিলাম, মিঠুয়া আমার হাতেই মানুষ।

মিঠুয়া আরেকবার 'প্লিজ' বলে আমার হাত ধরে বিষম একটা হ্যাঁচকা দেয়।

'উফ, ছাড় তো।'

মিঠুয়া এবার রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করে।

'এই তোমাকে বলে দিচ্ছি, মামা। মা যদি এরকম করে তাহলে বিয়ে করে এই যে বাড়ি থেকে বেরুবো তোমাদের কারো সঙ্গে আমার কোনো কানেকশন আর থাকবে না। এই শেষ।'

'আরে শোন, শোন।'

মিঠুয়াকে হাত ধরে কাছে টেনে আনি।

'ছাড়ো, ভাল লাগে না।'

মেয়েটার মন ফেরাতে আমি একটু খুনসুটি করি।

'কি ভাল লাগে না? বর?'

মিঠুয়া জিভ বের করে ভ্যাংচায় হঠাৎ। এক মুহূর্তের জন্য। আবার গম্ভীর হয়ে যায়। বালিকা আবার যুবতীর অভিনয়ে ফিরে যায়।

'তোর মাকে তো দোষ দিতে পারি না, মিঠুয়া, যেভাবে তুই বিয়েটা করছিস। আর এই কি তোর বিয়ের বয়স? কত হবি তুই? বল, কত? ষোলো থেকে সতেরোয় পড়েছিস। বল কিনা?'

মিঠুয়া ধমকে ওঠে, 'আমার বয়স নিয়ে তোমাকে পড়তে কে বলেছে?'

'বল, বড় জোর সতেরো। সতেরোর বেশি তো কিছুতেই নয়।'

'মামা।'

'এই তোর একটা বিয়ে করবার বয়স?'

'দ্যাখো মামা।'

মিঠুয়া চোখ গোল করে আমাকে আক্রমণ করবার একটা ভঙ্গি করে। আমি পেছু হটে যাই।

'আর তোর বর? তাও বুঝতাম, যদি সে—'

মিঠুয়া হাতের কাছে পানির গেলাশ নিয়ে আমার গায়ে সবটা পানি ছুঁড়ে মারে। আমি ভিজে যাই। মিঠুয়া দুপদাপ পায়ে ঘরে চলে যায়। আমি আমার ঘরে জামা পাল্টতে যাব, বাইরের দরোজায় রঙীন কামিজ চোখে পড়ে হঠাৎ। ফুরফুর করে বাতাসে উড়ছে দোরপর্দা। সেই পর্দায় ঢাকা পড়ে গেছে চেহারা, কামিজ ঢাকা দেহটা কেবল দেখা যাচ্ছে।

পর মুহূর্তে পর্দা সরিয়ে দেখা দেয় মিঠুয়ার প্রাণের বন্ধু সুরাইয়া। সুরাইয়াকে দেখে মাঝে মাঝে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই।

'আরে? কি হলো?'

সুরাইয়া আমার ভেজা জামা দেখে মুখে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে সমুখে ভাঁজ হয়ে পড়ে।

আমি গম্ভীর গলায় বলি, 'যাও, মিঠু ঘরেই আছে।'

সুরাইয়া ছিপের মতো শরীরটা যেন একজোড়া পাখা কেবল চায়। পাখা পায় না, তাই ওড়ে না। সুরাইয়া চোখের পলকে উড়ে চলে যায় মিঠুয়ার ঘরে। তার গায়ের জামার রঙীন ছবিগুলো উড়ে যায়। আমার মনে পড়ে যায়, আমি যে জামা পাল্টাবো, আমার জামা কোথায় ? একটা ভালো শার্ট আছে, মিঠুয়ার বিয়ের দিনের জন্যে তুলে রেখেছি। আরেকটা শার্ট ময়লা, সেই কবে থেকে। ধোয়া হয়নি এখনো। খাটের তলায় পড়ে আছে। কে ধোবে ? মিঠুয়া তার বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত। আমার শার্টের খবর কে রাখে ?

যা থাকে কপালে। ভেজা জামা গায়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। রাস্তা আমাকে নিয়ে যেতে থাকে, যেমন আমার কৈশোর থেকে সে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

২

কিছুদিন থেকে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। একে একে দেখা যাক। ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে ব্যাপারটা বোঝা যাক।

আমার বয়স এখন বাইশ। আমার কাছে সব সময় পরিষ্কার নয় যে, যখন আমরা বয়স বলি, কোন বয়সটা বলি? যে বয়সটা পার হয়ে এসেছি? না, যে বয়সটা ঠেলে নিয়ে চলেছি? এই যে আমার বাইশ, আমি কি বাইশ হয়ে গিয়ে তেইশ পুরো করবার দিকে চলেছি? না, বাইশ বছর চলছে আমার?

আসলে আমার একুশ। একুশ পার হয়ে বাইশ বছর চলছে। সামনের ষোলোই ডিসেম্বর বাইশ পুরো হয়ে যাবে। আমার জন্মদিন পড়েছে আমাদের বিজয় দিবসে। বিজয় দিবসটা খুব কান্নাকাটির ভেতর দিয়ে গেছে আমাদের। একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর। আমার তখন সাত। সাত বছরের কথা মনে থাকবার কথা নয়। আমার মনে আছে। সাত বছরে এতগুলো মানুষ হারানো, ভোলা যায় না। লোকে যখন বলে, তিরিশ লাখ লোকের মৃত্যু আমরা ভুলে গেছি, আমার অবাক লাগে। আমার বিশ্বাস হতে চায় না।

বালক বয়সে বড় হতে হতে শুনেছি, আমার মেজ ভাই প্রায়ই তখন বলতেন, বাংলাদেশে এমন একটিও পরিবার নেই একাত্তরে যাদের একজনও মারা যায়নি। আমিও তো বড় হয়ে দেখেছি, সরাসরি নিজের পরিবারে কেউ মারা না গেলেও চাচাতো মামাতো ফুপাতো ভাই বোন কেউ

যায়নি, এমন পরিবার একটিও নেই। তবু মানুষ কি করে ভুলে যায় কোন পথে ভুলে যায় ?

আমাদের বাড়িতে তো আমরা ভুলতে পারিনি।

নাকি, আমাদের বাড়িতে মৃত্যুর ভাগটা কিছু বেশিই ছিল আর দশটা পরিবারের তুলনায় ?

বড় ভাই, বড় দুলাভাই ; তারপর সেই দু'জনের শোকে আমাদের মা।

মায়ের কথা আমার খুব ভালো মনে পড়ে না। মাকে অনুভব করি, বাড়ির ভেতরে, বাড়ির সব জিনিশের ভেতরে রোজার দিনে, ঈদের দিনে, একুশে ফেব্রুয়ারীতে ; কিন্তু ফটোগ্রাফ ছাড়া মায়ের মুখ আমার মনে পড়ে না। ফটোতেও যখন দেখি, তখন কেমন যেন অচেনা এক মহিলা বলেই তাকে মনে হয়। আমি ঐ অনুভবের ব্যাপারটা নিয়ে সেবার একটি কবিতা লিখেছিলাম। আমরাই কয়েকজন একুশে ফেব্রুয়ারীতে যে সংকলন বের করেছিলাম, তাতে ছাপা হয়েছিল।

একজন বলেছিল, কবিতাটিতে মাকে নিয়ে ন্যাকামো করা হয়েছে।

আমাদের আরেকজন, ইব্রাহিম, তরুণ, রাগী, কবিতার বই আছে, বড় বড় কাগজে ছাপা হয়, সেই ইব্রাহিম বলেছিল, বাংলাদেশের কবিতায় মাকে নিয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি চলেছে। প্রধান কবিরা মায়ের ওপর কবিতা না লিখতে পারলে ভাত হালাল মনে করেন না। ইব্রাহিমের প্রশ্ন, আমি কি প্রকৃত কবি হতে চাই, না কবিখ্যাতি চাই ? কবিখ্যাতি চাইলে আমার মায়ের ওপর কবিতা লেখায় তার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সত্যি কবি হতে চাইলে এইসব বস্তাপচা বিষয় আমাকে ছাড়তে হবে।

আমার খুব রাগ হয়। ইব্রাহিমের সঙ্গে বেশ কিছুদিন কথা বলি না। ঘোষিতভাবে কথা বন্ধ করি না। ইব্রাহিমকে দেখলে এড়িয়ে যাই মাত্র।

কিন্তু একটা ক্ষতি হয়ে যায় আমার। আগে প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু লিখতে পারতাম। কিছু না হোক, চারটে নিটোল লাইন। এরপর থেকে কলম সহজে আর সরতে চায় না। আমার একটা অভ্যেস ছিল মাথার ভেতরে পংক্তি রচনা করা। অতঃপর পুরো একটা পংক্তি আর মাথায় আসে না। হয়ত বিচ্ছিন্ন একটি দুটো শব্দ। হয়ত একটি অপরিণত পংক্তি। এর বেশি নয়।

আগে কতদিন এমন হয়েছে—বাতি নিভিয়ে ঘুমোতে গেছি, মাথার ভেতরে কবিতা এসেছে। ধড়ফড় করে উঠে বসে, বাতি জ্বালিয়ে, কাগজ কলম টেনে নিয়েছি। লিখতে লিখতে রাত দুটো তিনটে হয়ে গেছে।

এখন ঘুমোতে যাই। বাতি নেভাই। অন্ধকার হয়। ঘুম আসে না। শব্দ আসে না। পংক্তি আসে না। চিত্রকল্প গড়ে ওঠে না। গলার ভেতরে অব্যয় ধ্বনি অনুভব করি, সেই ধ্বনিটুকুও নির্গত হতে অযুত বছর লাগে এমন বোধ হয়। কবিতার বদলে এইসব মাঝরাতে যুবকের যেমন হয় সেই নস্টামিও সাবলীলভাবে আমার দেহে আসে না। চটকে ছেনে নজেকে ক্লান্ত করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

কবিতা চলে যায়, আমার দেহ থেকে যায়। কবিতার বদলে অচিরে আমি আমার দেহটিকে আবিষ্কার করি। কিন্তু যেমন দেখেছি, দেহটি সতেজ নয়, প্রস্তুত নয়; তাকে খুঁচিয়ে জাগাতে হয়, তাকে দিয়ে যৌবনের অভিনয় করিয়ে নিতে হয়। একাকী ঘরে একাকী আমার বিছানায় এই অভিনয় আমার অভ্যেসে পরিণত হয়ে যায়। এ বিনা আমার আর ঘুম আসে না।

'সানোয়ার।'

আমার নাম ধরে কেউ আমাকে ডাকে। আমার নাম ধরে তো আমাকেই ডাকবে, আর কাকে ডাকবে? কিন্তু মাঝে মাঝে এখন আমার নিজেকে বিযুক্ত বোধ হয় আমার নাম থেকে। আমার নাম যেন কখনো আমার, এবং কখনো তা আমার নয়। যেন, অনেকের সঙ্গে আমি একটি নাম ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে আসছি। যেন, এতকাল নামটির ষোলো আনা মালিকানা আমার ছিল। আমি জানতাম না, অপর আরো অনেকেরই মালিকানা আছে, 'সানোয়ার' এই নামটির ওপর। তারা এখন দেশে ফিরে এসেছে, নামটি ব্যবহার করছে, অতএব আমি চব্বিশ ঘন্টার চব্বিশ ঘন্টাই নামটিকে পাচ্ছি না নিজের করে আর।

'কে?'

আপনারা কি দৈবে বিশ্বাস করেন? আমাকে ডাকছে ইব্রাহিম।

'কি রে?'

আমি এতটা আন্তরিক বা ঘনিষ্ঠ সুরে সম্বোধন করতে চাইনি ইব্রাহিমকে। ঐ 'কিরে' উচ্চারণটির জন্যে আমার অনুতাপ হয়। কে যেন আমার ভেতর থেকে উচ্চারণটি সম্ভব করিয়ে নেয়। আমি চোখে মুখে নিস্পৃহ একটা ভাব ফুটিয়ে রাস্তার ওপর অপেক্ষা করি। রাস্তা দিয়েই তো হাঁটছিলাম, রাস্তা ছাড়া আর কোথায় অপেক্ষা করব? এই রাস্তা দিয়ে আমি আজ অনেকক্ষণ হাঁটব। হাঁটলে আমার ভেতরের শুশ্রূষা হয়ে যায়। হাঁটার ভেতরেই এখনো আমার প্রাণ কিছুটা আছে। তাই ইব্রাহিম

যখন বলে 'চল, কোথাও বসি' আমি রাজী হই না। আমি হাঁটতে চাই। এবং একা। ইব্রাহিমের সঙ্গে নয়। কারো সঙ্গে নয়। কারো সঙ্গেই নয়।

'না, এখন চা খাবো না।' আমি শক্ত গলায় বলি ইব্রাহিমের দিকে ভালো করে তাকাই না পর্যন্ত। তাকালেই যদি দুর্বল হয়ে পড়ি।

'কথা ছিল।'

'পরে। চলি।'

ইব্রাহিম আমার হাত টেনে ধরে।

'দাঁড়া।'

আমি বলতে পারব না—কেন? আমার ভেতরটা রাগে ফেটে পড়তে চায়। কিন্তু আমি এটাও জানি এই রাগের সঙ্গে ইব্রাহিমের কোনো যোগাযোগ নেই। এটা আমার নিজের ওপরেই রাগ। ইব্রাহিম আর আমি প্রায় এক সঙ্গেই কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম। আমি এখন আর লিখি না, আমার কোনো বই নেই। ইব্রাহিমের তিনটি বই বেরিয়ে গেছে। কাজের জানি আমার ভেতরে ঈর্ষা হয়। আমি জানি আমার ঈর্ষা কোনো আমি কিছু নয়। রাগটা তাই দপ করে জ্বলে ওঠে বুকের ভেতরে।

আমার কবিতা না লেখার জন্যে ইব্রাহিম দায়ী নয়। কিংবা ইব্রাহিমই দায়ী। আমার কবিতার বিরুদ্ধ সমালোচনা ইব্রাহিমই প্রথম শুরু করে। ছাপিয়ে নয়; চায়ের আড্ডায়। ইব্রাহিমের কবিতা নিয়ে এখন আমি লিখিত আলোচনা হতেও দেখেছি। পুরো প্রবন্ধ নয়। সাধারণ কোনো প্রবন্ধের ভেতরে ইব্রাহিম আজকাল বেশ উল্লেখিত হয়। আমার ঈর্ষা হয়। ঈর্ষা কেন হয়, তার জন্যে রাগ হয়।

রাগ হলে আমার ভেতরে অদ্ভুত একটি ব্যাপার হয়ে যায়। আমার নিজের ওপরে নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তার মানে এ নয় যে আমি হৈ-চৈ চেঁচামেচি করতে থাকি। আমি নিঃশব্দ হয়ে পড়ি। আমি শীতল হয়ে যাই আমি অপরের অধিকারে চলে যাই। আমি ক্রীত-দাসের মতো বাধ্য এবং বিনীত হয়ে পড়ি। আমি আদেশ শ্রবণের অপেক্ষা করি।

ইব্রাহিম মোটা গলায় উচ্চারণ করে, 'বলছি কথা আছে। আয়।'

আমি তাকে অনুসরণ করতে থাকি।

শিশু পার্কের পাড় ঘেঁষে আমি ইব্রাহিমের পেছন পেছন হাঁটতে থাকি।

'আহ, পিছিয়ে পড়ছিস কেন

আমি কোনো কথা বলি না। ইব্রাহিমের সমান্তরাল হবারও চেষ্টা করি না। ইব্রাহিমই বরং পেছিয়ে আমার পাশাপাশি হয়। আবার দূরত্ব বাড়তে থাকে কয়েক কদম পরেই।

চটপটি ফুচকাঅলাদের কিছু ফোল্ডিং চেয়ার পার্কের রেলিং ঘেঁষে সাজিয়ে রাখা। ভাজ করে। সন্ধ্যের পর জমে উঠলে এগুলো পেতে দেবে। ইব্রাহিম কারো কাছে কোনো অনুমতি না নিয়ে দুটো চেয়ার টেনে পাতে। চোখের ইশারায় আমাকে আমন্ত্রণ জানায় বসতে।

আমি বসি।

ইব্রাহিম বলে, 'চটপটি খাবি ?'

'না।'

'এখানে তো চা হয় না। মাঝে মাঝে চাওলা আসে কেতলি নিয়ে। দেখি।'

'তুই বল কি বলবি।'

'আমি তোকে মনে মনে খুঁজছিলাম।'

'পত্রিকা বার করছিস

'না।'

'সংকলন ?'

ইব্রাহিম হেসে বলে, 'দূর। না। পয়সা নষ্ট।'

মনে মনে ভাবতে থাকি, তাহলে আমাকে ও খুঁজছে কিসের জন্যে ? সাহিত্যিক কারণ ছাড়া আর কি হতে পারে ?

তবু, সাহিত্যিক কারণের শেষ রাখব না ভেবে যোগ করি, 'আমিও আজকাল লেখা ছেড়ে দিয়েছি।'

'লিখে কোনো লাভ নেই।'

ইব্রাহিমের মুখে এ কথা শুনে আমি খুব অবাক হয়ে যাই। যে কবির কবিতা প্রায় প্রতি সপ্তাহে কোনো না কোনো কাগজে দেখি, সে বলছে লিখে লাভ নেই ?

'লিখে লাভ নাই কেন

'কি লাভ ?'

'লাভের কথাই বা কেন ? লাভের কথা ভেবে কি আর লিখতে শুরু করেছিলি ?'

ইব্রাহিম আমার হাঁটুতে চাপড় মেরে বলে, 'একটা যুবতী মেয়ে পেলে সে রাতে আমি আর কবিতা লিখব না।'

'কি বলছিস ?'

'দেশে গণতন্ত্র এসে গেলে আমাদের কবিতার কি হবে তখন ? কার বিরুদ্ধে চিৎকার করবে কবিরা ?'

আমার সন্দেহ হয়। আমি বাতাসে ঘ্রাণ নেবার জন্যে উদগ্র হই। না। ঘ্রাণ পাই না। গাঁজার ঘ্রাণ। ইব্রাহিম গাঁজা খায়নি। ইব্রাহিমের হাতে সিগারেট পোড়ে। সিগারেটের ভেতর গাঁজা থাকলে অন্য রকম ঝাঁজ টের পাওয়া যেত। তার সিগারেটের ভেতরেও গাঁজা নেই। অথচ আমার মনে হচ্ছে সে নেশা করেছে।

ইব্রাহিম বলে, 'অতএব, লেখাটেখার কথা রেখে দে। ওসব কিছু নয়। তোকে অন্য দরকারে খুঁজছি। রাফিয়া তোর বোন না ?'

আমি অবাক হয়ে যাই। আমার মেজবু এক হিসেবে ইব্রাহিমেরও মেজবু'র মতো। তাকে নাম ধরে ডাকা আমার কাছে চমকপ্রদ মনে হয়। বোধ হয় আমি ক্ষুণ্ণও হয়ে পড়ি।

আমার ক্ষোভ দাগিয়ে দেখাবার জন্যে বলি, 'মেজবুর কথা বলছিস ?'

হ্যাঁ, তোর মেজবু রাফিয়া।' এক ধরণের অসহিষ্ণুতা আমি লক্ষ্য করি ইব্রাহিমের গলায়।

আমি আরো এক প্রস্থ অবাক হয়ে যাই। এরকম গলায় তো আমার মেজবু'র বিষয়ে ইব্রাহিমের কথা বলবার কথা নয়। কতদিন আমাদের বাড়িতে এসেছে ইব্রাহিম। কতদিন রাতে আমাদের বাড়িতে থেকেও গেছে। তখন মেজবু'র বিয়ে হয়নি। বাড়িতেই ছিল। কলেজে একবার ফেল করে লেখাপড়া ছেড়ে দিল। তারপর থেকে তার পড়া বলতে সিনেমা পত্রিকা পড়া। আর একে ওকে তাকে ধরে সিনেমা দেখা। সন্ধ্যার সময় টেলিভিশন খুললে পাশের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকা। বড়বু এই নিয়ে কতদিন বকেছে। কতক অসুখ আছে, চিকিৎসা ধরে না।

দু'একবার ইব্রাহিমকে নিয়েও সিনেমায় গেছে মেজবু। এখন আমার মনে পড়ছে। আমার মনটা কি খুব কুটিল জটিল হয়ে পড়ছে ? মেজবুকে নিয়ে ইব্রাহিমকে নিয়ে কি সব ভাবছি ?

নাকি, মিঠুয়ার বিয়ের কেসসা আমার চোখ খুলে দিয়েছে। জগতে সবকিছুই সম্ভব বলে বোধ হচ্ছে। তাই কি ?

মিঠুয়ার কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। আজ তার গায়ে হলুদ। এতক্ষণে হয়ত তত্ত্ব নিয়ে এসে গেছে বরের বাড়ি থেকে মেয়েরা। মিঠুয়া আজ সকালেই বলছিল, সে নাকি তার বরকে বলে দিয়েছে দশ সেরের

কম ওজন রুই দিলে মাছ ফেরত দেয়া হবে। আর মাছের মুখের ভেতরে মোহর গুঁজে দিতে হবে।

আমি অবাক হয়ে যাই। গায়ে হলুদের এত সাবেকি নিয়ম কানুন ষোলো বছরের ঐ মেয়েটি জানে কি করে? সেদিন পর্যন্ত হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াত। সেদিন পর্যন্ত পিঠ খুলে ঘামাচি মেরে দেবার জন্যে কোল ঘেঁষে বসে পড়ত।

'কি ভাবছিস?'

ইব্রাহিমের গলা আমাকে চমকে দেয়।

'কই? না।'

'হুঁ, ভাবছিস তো। আমি দেখছি না তাহলে তুই জানিস?'

'কি

'কিছু কিছু জানিস? নয়?'

'কি বলবি তো?'

তোর মেজবু। রাফিয়া। তার সঙ্গে তোর দেখা হয় না বলতে চাস?

আমি কোনো তালমাথা পাই না ইব্রাহিমের কথার।

'দেখা হবে না কেন? দেখা হয়। আমি ওর বাড়িতে বেশি যেতেটেতে পাই না। ও-ই আসে। খুব আসে। এই তো পরশুই এসে গেল। আজ এতক্ষণে এসে গেছে বোধহয়। আমার ভাগনির গায়ে হলুদ। বড়বু'র মেয়ে। মিঠুয়া।'

বলতে বলতে আমার ভেতরে উদ্বেগটা ধাঁ ধাঁ করে বাড়তে থাকে।

ইব্রাহিম আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টি নিয়ে। হাতে সিগারেট পোড়ে। ইব্রাহিম কি গাঁজা ছেড়ে দিয়েছে? এখন আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে গাঁজা খেয়ে দেখতে। আগে এত অনুরোধ করেছে, টলিনি। সিগারেটই আজ পর্যন্ত ধরিনি। মদ এক ফোঁটা না। কবিতা কি আমার শেষ পর্যন্ত এই কারণে হলো না? আমার কোনো নেশা নেই। আমি বাইরে। আমি বাইরের।

এক চাঅলাকে দেখা যায়। ইব্রাহিম তাকে তুড়ি মেরে ডাকে। এত ছোট কাপ, এক কাপে আমাদের কারোরই শানায় না। দু'কাপ করে হয়ে যায়। ইব্রাহিম দাম দেয়। চাঅলা পায়ের কাছে তবু বসে থাকে। সে তৃষিতের মতো তাকিয়ে থাকে ইব্রাহিমের দিকে। তখন ইব্রাহিম তাকে হাতের আধখানা সিগারেট দেয়। বড় খুশী হয়ে ছোকরা নারকোল গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে। রেলিংয়ে হেলান দিয়ে সিগারেট টানতে

থাকে।

ইব্রাহিম আমাকে বলে, 'তোর বোন নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তোকে খুঁজছিলাম।'

'এই জন্যে ?'

'হ্যাঁ, বলতে।'

'নষ্ট ?' ব্যাপারটা আমি বুঝে নিতে চাই।

'ঐ যাকে বলে আর কি।'

এতক্ষণ আমার বুকের ভেতরে উদ্বেগ ছিল, যতক্ষণ বিষয়টা শুনিনি। এখন শুনে আর কিচ্ছু লাগছে না। না উদ্বেগ, না ভয়, না কৌতূহল। কিচ্ছু না।

আমি খুব স্বাভাবিক গলায় জানতে চাই, 'নষ্ট মানে কি ? বলবি তো নষ্ট মানেটা কি হলো

বরং আমার গলার স্বাভাবিকতায় অপ্রতিভ হয়ে পড়ে ইব্রাহিম। ইব্রাহিম এখনো কবিতা লেখে, আমি আর লিখি না। ইব্রাহিমের কবিখ্যাতির জন্যে আমার ঈর্ষা হয়। ইব্রাহিমের সাক্ষাতে আমি বিজিত বোধ করি। এখন আমার কণ্ঠের ভাবলেশহীনতা দিয়ে কবি ইব্রাহিমকে কাবু করতে পেরেছি দেখে আমার মজা লাগে। আমি রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে চাই এই ঘটনাটি।

আমি আরো স্বাভাবিকতা এনে ফেলি আমার কণ্ঠে। এবং সেই সঙ্গে, শীতলতা। নির্লিপ্ততা।

'আমার বোন নষ্ট হয়ে গেছে মানে কি ? শুচ্ছে ?'

ইব্রাহিম চোখ ফিরিয়ে নেয় আমার চোখ থেকে।

'কার সঙ্গে শুচ্ছে ?'

ইব্রাহিম একটা সিগারেট ধরায়।

আমি নাছোড়বান্দার মতো বলে চলি, 'দুলাভাই তো আবুধাবিতে। বছরে একবার আসে। বাকি সময় মেজবু করে কি ? বল ? তার শরীর নেই ? শরীরের দরকার নেই ?'

'বাস্টার্ড।' চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠে দাঁড়ায় ইব্রাহিম। তার চোখমুখ লাল হয়ে গেছে।

'বোস। বোস না ?'

'আমি—আমি ভালো বুঝে তোকে বলতে এলাম—আর—আর তুই ? তুই

ইব্রাহিম তার বক্তব্য শেষ না করে হনহন করে চলে যায়। সে তার কবি প্রতিভা নিয়ে চলে যায়। সে তার তিনখানি কবিতার বইয়ের ওজন বহন করে চলে যায়। সে একজন একদা কবির কাছ থেকে পরাজিত হয়ে চলে যায়। ইব্রাহিমের দ্রুত ধাবমান নিতম্বের ভয়ার্ত ওঠাপড়া দেখে আমার হাসি পায়।

নিঃশব্দে আমি হাসি। কিন্তু আমার ভেতরে সেই উদ্বেগ হঠাৎ ফিরে আসে। কোনটা আমার সত্যি, আমি বুঝে পাই না।

আমার নির্লিপ্ততা সত্যি ?

অথবা, আমার উদ্বেগ

কোনটা ?

শিশু পার্কের ওই দিকটায় একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর আত্ম-সমর্পণের দলিলে সই করেছিল নিয়াজি। ঠিক জায়গাটা কেউ আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেনি। ঠিক জায়গাটা কেউ চিহ্নিত করে রাখেনি। আমাদের বৈঠকখানায় বড় ভাই যেখানে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন বড়বু সেখানে একটা জায়নামাজ পেতে দিয়েছেন। মায়ের নিজের জায়-নামাজ। পনেরোটা বছর জায়নামাজ সেখানেই পাতা আছে। বাড়িতে যারা নামাজ পড়ে তারা কখনো কখনো ঐ জায়নামাজে পড়ে।

আমি এখন উঠে হাঁটতে থাকি। শিশু পার্কের কোন জায়গায় আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছিল অনুমান করে চলি। হাঁটি। দাঁড়াই। আবার হাঁটি। এখানে ছিল ? কিংবা ওখানে ? অথবা ঐখানে ?

৩

মেজবু'র বিষয়টা আমার মাথায় ঘুরতে থাকে। দ্রুত নয়। ধীর গতিতে। যেন আমার মায়ের পেটের বোন, তার সত্যি সত্যি কোনো ঘটনা নয়; কোথাও শোনা কিংবা পড়া একটি গল্পের একটি চরিত্র নিয়ে ভাবছি। ইব্রাহিম বলে গেছে, 'তোর বোন নষ্ট হয়ে গেছে।' এ বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। মেজবুকে নিয়ে এ রকম কথা উঠতে পারে, আমার দুঃস্বপ্নেও ছিল না। চমকে উঠেছি, বলব না। লজ্জা পেয়েছি, উঁহু, না। ভয় পেয়েছি, তাও নয়। কৌতূহল? কিছুটা হয়ত। সেই কৌতূহলই এখন বড় হয়ে যেতে থাকে। এই বিশেষ চরিত্রটি, যার নাম রাফিয়া, সে কিভাবে নষ্ট হয়ে গেছে জানতে ইচ্ছে করে। আমি হাঁটতে থাকি।

এলোমেলো আমি হাঁটতে থাকি। গোটা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের চারপাশ দু'দুবার চক্কর লাগিয়ে ভেতরে ঢুকি। ভেতরে কোণাকুনি একবার। তারপর রাস্তা পেরিয়ে রমনা উদ্যানে।

মনস্থির করবার জন্যে সময় নিচ্ছি, তা নয়। মন আমি স্থির করেই ফেলেছি। মেজবুকে আজই জিগ্যেস করব। আসলে দেরী করছি মিঠুয়ার গায়ে হলুদ শেষ হবার জন্যে। মেজবুকে আমাদের বাড়িতেই পাবো। মিঠুয়ার গায়ে হলুদে আসবে। স্বামী বিদেশে, কোলে বাচ্চা নেই; কাজেই মেজবু কি আর এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যাবে? হয়ত আজ থেকে যাবে আমাদের ওখানেই। একটু রাত হোক। ফিরে গিয়ে জমিয়ে জিজ্ঞেস করব।

এতক্ষণে পা ধরে আসে। সারা রমনা উদ্যান জুড়ে গোল গোল অন্ধকার, মাঝখানে দুধশাদা আলো বয়ে যাচ্ছে। কখনো দু'একটি লোক। কখনো কেউ না। লেকে এক ফোঁটা পানি নেই। লেকে মাটি কাটা চলছে। লেকের বুকের ভেতরটা বড় ন্যাংটো দেখাচ্ছে।

'স্যার।'

পেছন ফিরে দেখি, একটা লোক। তার পাশে লাল জ্যালজেলে ওড়না জড়ানো একটি মেয়ে। মিঠুয়ার চেয়ে একটুও বড় হবে না। মিঠুয়ার কথা মনে পড়ে যায়। এতক্ষণে গায়ে হলুদ নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি বাড়ি ফিরলেও পারি।

লোকটি মেয়েটিকে আলোর ভেতরে ঠেলে দেয়। আমার সমুখে ঠেলে দেয়। মেয়েটি আমার মনোহরণ করতে সবক'টি দাঁত বের করে প্রাণহীন হাসে।

আমার রাগ হয়। আমি আগেই বলেছি, ভীষণ রেগে গেলে আমি আমার ওপর থেকে সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। আমাকে তখন যা করতে বলা হয় তাইই করি।

লোকটি আমাকে ইশারা করে বলে, 'স্যার' একটু এদিকে আসেন।'

আমি তাকে অনুসরণ করে অন্ধকারের ভেতরে প্রবেশ করি। আমরা তিনজন এখন এই গোল অন্ধকারের ভেতর বাস করছি।

লোকটি বালিকার বুক থেকে লাল ওড়নাখানি সাঁৎ করে টেনে নেয়। মেয়েটি অবিলম্বে তার বুকে ঢাকতে হাত তোলে না। বরং হাত দু'পাশে টান টান করে ঝুলিয়ে রেখে মাথা একপাশে কাৎ করে নতুন ভঙ্গীতে আমাকে দেখতে থাকে।

'স্যার।'

'বলুন।' লোকটিকে আমি আপনি সম্বোধন না করে পারি না; অথচ লোকটির সঙ্গে ভদ্রতা করা দূরে থাক কথা বলাই উচিত নয় আমার।

অতঃপর লোকটি কি বলে আমার ভালো করে বোধগম্য হয় না। কেবল এটুকু বুঝি যে, আমাকে সে এর আগে এখানে কখনো দেখেনি। তাই সে আমাকে তার হাতের সবচেয়ে ভালো জিনিসটিই উপহার দিতে চাইছে, যাতে আমি বারবার তার কাছে উপহার নিতে ফিরে আসি। দামও সে বেশি কিছু চায় না। যা আমার ইচ্ছে।

আমি চমকে উঠি।

লোকটি কখন আমার হাত টেনে নিয়ে বালিকার বুকে রেখেছে।

'নিজে একবার দেইখা লন, স্যার।'

আমার আঙুলগুলো ঈষৎ বসে যায়। ইচ্ছায় নয়, আকাংক্ষায় নয়; আঙুলগুলো স্বাধীনতা পেয়ে যায় আমার শরীর থেকে এবং উত্তল মাংসপিণ্ডকে আবৃত করে। করতলে নাইলনের কাপড় খসখস করে। আর কিছু না। তবু আমি আঙুলগুলো ফিরিয়ে নিতে পারি না। আমি বরং আমার গোটা হাত থেকেই আমার নিজেকে ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন বোধ করতে থাকি।

'স্যার। চলবে?'

আমার কণ্ঠ থেকে অব্যয় একটি ধ্বনি বেরোয় মাত্র।

লোকটি আমাকে কি এক অদ্ভুত উপায় পরিচালিত করে সিমেন্টের বেঞ্চের ওপর বসিয়ে দেয়। বালিকা আমার কোলে বসে পড়ে।

মিঠুয়ার বান্ধবীরা এতক্ষণে সবাই চলে গেছে কি? সুরাইয়া? সেও চলে গেছে? সুরাইয়ার কামিজের রঙিন নকশাগুলো আমার চোখের ভেতরে উড়তে থাকে। সুরাইয়া কেবল পাখা পায় না বলে উড়তে পারে না সেই কবে, সেই কতদিন আগে সুরাইয়া একদিন দুপুর বেলায় আমার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কনুই নামিয়ে বড় আবদার করে বলেছিল, 'আমাকে একটা কবিতা লিখে দেবেন প্রেমের কবিতা?' এখন আবার হঠাৎ সব মনে পড়ে যায়। মনে পড়বার কোনো কথাই নয় এই রমনা উদ্যানে, অন্ধকারে, নষ্ট বালিকার টকতীব্র ঘামের গন্ধের ভেতরে।

একপাশে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে আমি উঠে দাঁড়াই। বালিকা আমার ঘাড়ের ওপর চুমো কি কামড় দিতে গিয়েছিল। আমি তাদের পেছনে ফলে হনহন করে হাঁটতে থাকি। প্রায় দৌড়ুতে থাকি। আমার পেছনে দু'জনের মুখে বাপ মা তোলা গাল শুনতে পাই। ঢাকা ক্লাবের সম্মুখে একটা ঝকঝকে শাদা গাড়ির নিচে পড়তে পড়তে বেঁচে যাই। মালিক নিজেই চালাচ্ছিল গাড়ি। সে নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসে। প্রাণ হাতে করে আমি যেভাবে শূন্যে লাফিয়ে উঠেছিলাম তা দেখে সে নিশ্চয়ই বিমল আনন্দ পেয়েছে। অথবা এই সন্ধ্যে বেলাতেই কষে মদ টেনে ক্লাব থেকে শ্রীমান বেরিয়েছেন।

বাড়ি ফিরে শুনি মেজবু মিঠুয়ার গায়ে হলুদে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু চলে গেছে।

গায়ে হলুদের সময় আমি ঘরে ছিলাম না বলে মেজাভাই আমাকে খানিক বকাবকি করে নেয়।

'কি তোর আক্কেল বলতো ? আমি একা সব সামলাব ? আমার একার সব দায় দায়িত্ব ? ভাগনি আমার একার ? বাড়ির বড় হয়ে আমি অপরাধ করেছিলাম ?'

মেজ ভাই আজকাল কথা একটা শুরু করলে আর থামতে জানে না। একই ভাব চোদ্দভাবে প্রকাশ করে। তারপরও মুখে তৃপ্তির ছাপ নেই। যেন কথাটা আরো দু'চারভাবে প্রকাশ করা যেত, কিন্তু প্রতিভা সহযোগীতা করল না।

মেজ ভাই একটু থেমে আবার শুরু করে, কারণ নতুন একটা দুয়ার খুলে গেছে তার মাথায়। সে বলে চলে, 'আমার অপিসে এত কাজ ফেলে চলে এলাম। আমি আসতে পারলাম, তুমি পারলে না।'

নাহ, আর পারা যায় না। আমি ওপরে উঠে যাই। দোতলায়। দোতলায় আমার ঘর, বড়বু আর মিঠুয়ার ঘর। মেজ ভাই থাকে নিচের তলায়। পুরনো দিনের বাড়ি। কাদার গাঁথনি। দেড় হাত পুরু সব দেয়াল। ঘরের ভেতরে বক বক করুক মেজ ভাই, দেয়াল ভেদ করে আমার ঘরে পেঁছুবে না।

বড়বু ঘরে নেই। মিঠুয়া একা চুপচাপ বসে রয়েছে খাটের ওপর। মাথার ওপর ন্যাংটো একটা বালব জ্বলছে। আজ গায়ে হলুদের জন্যে বোধহয় একশ পাওয়ারের বালব লাগানো হয়েছে। সারা ঘর ভাংগাচোরা চুন সুড়কি নিয়ে দগদগ করছে জোরালো আলোয়।

'কিরে মিঠু ? হয়ে গেল ?'

মিঠুয়া কোনো উত্তর দেয় না।

কাঁচা হলুদের ঘ্রাণ সারা ঘরে। মিঠুয়ার মুখে কাঁচা হলুদ রঙ। মাড় দেয়া লালপেড়ে হলুদ শাড়ি ফুলে রয়েছে মিঠুয়াকে ঘিরে। যৌবনের একটা গাঢ় গন্ধ টসটস করে পড়ছে মিঠুয়ার গা বেয়ে।

'রাগ করেছিস ?'

'করেছি তো।'

'আমি তো তোকে সেই দুপুরেই বলেছি, মেয়েলি ব্যাপারে আমি নেই।'

'বিশ্বাস করি না।'

চমকে উঠি। সত্যি সত্যি চমকে উঠি। বহুদিন চমকে উঠিনি। নতুন লাগে।

'বিশ্বাস করিস না মানে ? মিঠু ?'

'তুমি আর মা এক দলে। তোমরা চাও না আমার বিয়ে, আমি জানি না বুঝি ? জানি, জানি, জানি। তুমি আসলে আমার হলুদে থাকবে না এই তো ?—তাই থাকোনি। সত্যি বললেই হয়। অত ঘোরপ্যাঁচ কেন ?'

'আচ্ছা বেশ, সে ফয়সালা তোর সঙ্গে পরে হবে।'

'পরে আর কবে ?'

'কেন ? টাইম ফুরিয়ে যাচ্ছে নাকি ?'

'আমার সঙ্গে আর দেখা হলে তো ?'

'কি বলছিস তুই ? দেখা হবে না ?'

'দেখো। তখন দেখো। মাথা কুটে মরলেও মিঠুয়াকে পাবে না।'

আমি চুপ করে কতক্ষণ বসে থাকি।

'তুই সত্যি রাগ করেছিস, মিঠু। তোর মা বুঝি গায়ে হলুদে নামেননি ?'

মিঠুর নীরবতা থেকেই বুঝে নিই, বড়বু ঘর থেকে বেরোননি।

'বড়বু নামেননি তো ম্যানেজ করলি কি করে ?'

'ম্যানেজের আবার কি আছে ? ওরা সব জানে। আমাদের বাড়ির খবর ওরা ভালো করেই জানে।'

'জানবে না ? তুই এতদিন প্রেম করলি, বাড়ির খবর কি আর বলিসনি তাকে ?'

মিঠুয়া কথা ঘুরিয়ে নেয়। সম্ভবত বুঝতে পারে যে বাপের বাড়ির বদনাম হবু স্বামীর কাছে করাটা ঠিক অনুমোদনযোগ্য নয়। সে বলে, 'খালা এসেছিল, খালাই সব করল। আর মেজ মামা অপিস থেকে এসেছিল।'

'সে আমি জানি। তোর মেজ মামা বোধহয় এখনো আমার গুষ্টি উদ্ধার করছে। মুক্তিযোদ্ধার মেজাজ যে এত খিটখিটে হয় তোর মেজ মামাকে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। মুক্তিযোদ্ধা হবে নোবল ম্যান, সংসারের ছোট খাটো তুচ্ছাতুচ্ছ নিয়ে সে কেন মাথা ঘামাবে ? দেশের জন্যে যুদ্ধ করেছে। দেশমাতৃকা। সোজা কথা ? কিন্তু তোর মেজ মামাকে দ্যাখ।'

আমার কৃত্রিম গাম্ভীর্যমাখা বক্তৃতা শুনে ফিক করে হেসে ফেলে মিঠুয়া।

'চুপ করো তো, মামা। চুপ করো।'

'তো খালা থাকল না ? চলে গেল

'কবে থাকে ? কিছুদিন থেকে দেখছ না, এসেই কেবল যাই যাই করে।'

আমার এখন চোখে পড়ে। তাইতো। মেজবু আজকাল এ বাড়িতে এসে থাকতেই চায় না। কত যেন কাজ পড়ে আছে তার। ইব্রাহিমের কথা মনে পড়ে যায়। 'তোর বোন নষ্ট হয়ে গেছে।'

আমি উঠে দাঁড়াই।

মিঠুয়া নীরব চোখ তুলে আমাকে অনুসরণ করে। তারপর আমি যখন দরোজায় সে বলে, 'মনে হচ্ছে কোথাও চললে ?'

'হ্যাঁ।'

'আবার ? এখন

'দরকার আছে। এসে তোর সঙ্গে গল্প করব। সব শুনব।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই পেছন থেকে মেজ ভাই চিৎকার করে ওঠে, 'এই, এই, শুয়ার।'

সংগত কারণেই সম্বোধনটি আমি উপেক্ষা করি। উত্তর দিলেই স্বীকার করে নেয়া হবে যে আমি বরাহ বৈ আর কিছু নই। আমি সাবলীলভাবে বাইরের দরোজার কাছে পেঁছে যাই।

মেজ ভাই চিৎকার করতে থাকে, 'আমার অপিস আছে। নাইট শিফট। বাড়িতে থাকবে কে ? বিয়ের বাড়ি। বিপদ আপদ হলে আমি কিছু জানি না, বলে দিলাম।'

ততক্ষণে আমি রাস্তায় নেমে গেছি।

৪

মেজবুর ব্যাপারটা আমাকে জানতেই হবে। জেনে কি লাভ হবে জানি না। জানতেই হবে। আমি একটা রিকশ ধরি। মেজবুর বাড়িতে গিয়ে ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভাড়া মেটাবো ভেবেছিলাম। ফেঁসে গেলাম। মেজবু বাড়িতে নেই। অতএব গাঁট থেকে গচ্চা দিয়ে, রিকশ বিদায় করে দিলাম।

মেজবুর ছোট দেওর সুলতান মোহাম্মদ। আকারে পিচ্চি, প্রকারে মহা ওস্তাদ। সে এক চোখ একটু ছোট করে জিজ্ঞেস করে, 'কি ব্যাপার, ভাবীকে খোঁজ করছেন ?'

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম।'

'আজ না আপনাদের বাড়িতে বিয়ে ?'

'হ্যাঁ, বিয়ে। মিঠুয়ার।'

'ভাবীতো বিয়েতে যাবে বলে বেরুলো।'

সুলতান মোহাম্মদের অপর চোখটিও এবার মানানসই ছোট হয়ে আসে। তীক্ষ্ন দু'টি চোখের তারা আমাকে দেখতে থাকে। নিয়ন-বাতির ফটফটে আলোয় রাস্তা চিৎ হয়ে আছে। আমার পায়ের তলা একটু টলমল করে ওঠে।

'ভাবী যায়নি নাকি ?'

আমি হাঁ-হাঁ করে উঠি। 'না, যাবে না কেন ? নিশ্চয়ই গেছে। আমিই বাইরে ছিলাম। ভাবলাম বু' হয়ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছে।'

'নাহ। মনে হয়, আপনাদের ওখানেই আজ থাকবে।'

'হ্যাঁ, বিয়ে বাড়ি তো।'

আমি সরে আসবার জন্যে পাশ ফিরি। ঠিক ফিরতে পারি না। বাধা পাই।

'এই যে। খবর রাখেন

আমি একটু অবাক হয়ে যাই। কোন খবর রাখার কথা শুধোচ্ছে সুলতান ?

'জানেন, ভাবী সিনেমায় চান্স পেয়েছে ?'

'সিনেমায় ?'

'হ্যাঁ, সিনেমায়। আখতার মুসার নাম শোনেননি ? পরিচালক। তার বইয়ে ভাবী নামছে।'

'জানি।'

'জানেন

'হ্যাঁ, জানি। পুরনো খবর।'

'জানেন তো এমন ভাব করলেন কেন যে হঠাৎ শুনলেন ?'

আমি সুলতান মোহাম্মদের ঘাড়ে হাত রেখে বলি, 'ফিলমের ব্যাপার তো। পত্রিকায় অ্যানাউন্স না হওয়া পর্যন্ত চেপে রাখতে হয়। জানি না জানি না ভাব করতে হয়। কথা দশকান হয়ে গেল কে কোথায় ভাংতি দেবে, আপনি জানেন ?'

সুলতান মোহাম্মদ আমাকে সহজে রেহাই দেয় না। সে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। বেশ ভালো করে আমাকে নিরিখ করে।

'তার মানে আপনার সাপোর্ট আছে ?'

'কি ব্যাপারে ?'

'ভাবীর সিনেমায় নামার ব্যাপারে ?'

'আরে, আমার এর মধ্যে কি ?' আমি দু'দিকে দু'হাত উড়িয়ে দিয়ে মুক্ত বিহংগের অভিনয় করি। অতঃপর আরো যোগ করি, 'আমি কি ওর গার্জেন ? আপনার ভাই কি বলেন ? আমার দুলাভাই ?'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'কাকে

'কাকে আবার ? ভাবীকে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভাইজানের মত নিয়েছিলেন ?'

'তো কি বলল ?'

'হেসে খুন।'

'হেসে খুন মানে ?'

'হেসে খুন মানে হেসে খুন। বাংলা ভাষা আমি তৈরি করেছি ?'

সুলতান মোহাম্মদ সত্যি সত্যি বেসামাল রকমে চটে গেছে। রাস্তার আলোর নিচে খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে আছে, যেন তার আর কোনো ঠিকানা নেই।

এক মুহূর্তের জন্যে ছবিটা আমার চোখে পড়ে। বড় অদ্ভুত ছবি। রাফিয়া আমার মায়ের পেটের বোন, সে নষ্ট হয়ে গেছে, সিনেমায় নামছে—এত সব শুনেও আমার কোনো ভাবান্তর নেই; আমি ভালো করে ব্যাপারটা আমার নিজের বলে এখন পর্যন্ত ভাবতেই পারছি না; যেন অন্য কারো বোন। আর এদিকে, সুলতান—রাফিয়া তার ভাইয়ের বিয়ে করা বৌ মাত্র, তালাক দিলেই এক ফুঁয়ে সম্পর্ক শেষ, কোথাকার ভাবী কোথায় ভেসে যাবে; সেই ভাবী সিনেমায় নামছে বলে সুলতান জগত অন্ধকার দেখছে।

কোমল গলায় সুলতানকে আমি বলি, 'মেজবু নিশ্চয়ই দুলা-ভাইয়ের মত পেয়েছে, সুলতান সাহেব। নিশ্চয়ই চিঠি লিখে মত আনিয়ে নিয়েছে। মত ছাড়া কোনো বিবাহিত মেয়ে কিছু করতে পারে ?'

কথাটা বলেই বুঝলাম, খুব একটা পোক্ত কিছু হলো না। স্বামীর মত ছাড়া বিবাহিত মেয়ে কিছু করতে পারে না, কক্ষনো পারে না, একে-বারেই পারে না,—পারে না কি ?

এদিকে মনের মধ্যে আমার সন্ধান চলছে। মেজবু গেল কোথায় আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে মিঠুয়ার গায়ে হুলুদ হয়ে যাবার পর পরই। স্বামীর বাড়িতে ফেরেনি। আমাদের বাড়ির ধারণা, সে স্বামীর বাড়ি গেছে। তার স্বামীর বাড়ির ধারণা, আমাদের বাড়িতে থেকে গেছে। বাহ। বেশ।

অন্য কিছু নয়; মেজবুর কোনো বিপদ-আপদ না হয়, ঠকে না যায়, পড়ে না যায়—আমার বড় মায়া হতে থাকে। আমি এখন এই রাতে কোথায় তাকে পাই ?

একটা সূত্র আছে। কিন্তু সেখানে যাওয়া কি ঠিক হবে ?

সুলতান মোহাম্মদ বলে, 'চললেন ? বসবেন না ?'

'না। নাহ।'

'ভাগনির বিয়ে দিচ্ছেন, শুনলাম জামাইয়ের বয়স নাকি তার তিন ডবল ?'

'তিন ডবল ?'

'ঐ আর কি ? বয়সের ডিফারেনস নাকি অনেক। ভাবী বলছিল।'

'হ্যাঁ। একটু। আচ্ছা। আসি।'

সুলতান মোহাম্মদ কি এটাও শুনেছে, মিঠুয়ার হবু স্বামীর এটা দ্বিতীয় বিয়ে ? মেজবু বয়সের কথা বলেছে, এটা কি আর বলেনি ?

নাহ, মিঠুয়া এটা কি করল ? ছেলের অভাব ছিল ? আর এই কি মিঠুয়ার বিয়ের বয়স হয়েছিল ? আমার বয়স বাইশ। আমি তো এখনো দু'চার দশ বছরের ভেতরে নিজের বিয়ে ভাবতেই পারি না।

বড় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াই। যেতে হলে এখন আমাকে যেতে হয় ইব্রাহিমের বাড়িতে। ইব্রাহিমের বড় ভাই হচ্ছে আখতার মুসা। সুলতানের কথা অনুযায়ী এই আখতার মুসাই মেজবুকে সিনেমায় নামাচ্ছে।

আখতার মুসা এখন ছবিটা যেন কিছু পরিস্কার হয়ে আসে। ইব্রাহিম নিশ্চয়ই আমার মেজবুকে তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখেছে। কিংবা এমনও হতে পারে মেজবুই ইব্রাহিমকে ধরে আখতার মুসার কাছে পেঁৗছেছে। ইব্রাহিমের সঙ্গে মেজবুর পরিচয় তো অনেক দিনের, সেই যখন ইব্রাহিম আমাদের বাড়িতে খুব আসত। সিনেমায় নামার শখ অনেক দিনের মেজবুর। ভারী চটপটে ঝকঝকে চেহারা। চোখের কি ভাষা। অনবরত কেউ যেন কোথাও নিঃশব্দে একটা নাচ করে চলেছে।

খুব ফটো তোলাতো মেজবু। স্টুডিওতে গিয়ে। বাড়িতে ডাকিয়ে। পার্কে। বনভোজনে। কোথায় না ? ক্যামেরা দেখলেই আর স্থির থাকতে পারত না মেজবু। আর জুটেও যেত ক্যামেরা। একেক দিন একেক প্যাটার্নের আদম। চোখে সানগ্লাস। হাতে ক্যামেরা। ট্রাউ-জারের পকেট মানিব্যাগে ঠেলে ফুলে ওঠা। চলো, ছবি তুলি। চলো, চাইনিজ হয়ে যাক। চলো এই। চলো ওই। কয়েক দিন এই চলল। তারপর হুউস করে একদিন নেই। আবার কয়েকদিন পরে আরেকজন। চোখে সানগ্লাস। হাতে ক্যামেরা। আমাকে দ্যাখো। কেমন আমি ভেংগেছি দুয়ার, এসেছি জ্যোতির্ময়।

আর সকলের মুখে সেই এক প্যাচাল। রাফি, শাবানা তোমার কাছে কিছু লাগে না। রাফি, কবরী তোমার বাসন ধোবার উপযুক্ত নয়। রাফি, তুমি সুচিত্রা। রাফি, তুমি সন্ধ্যা রায়।

সকলের মুখে সেই এক আশ্বাস। রাফি, আমার এক বন্ধু পরিচালক।

রাফি, আমার মামাতো ভাইয়ের শালা প্রডিউসার।

আমি বলতাম, 'বু, এসব বোগাস।'

গুনগুন করত আর মিষ্টি মিষ্টি হাসত মেজবু আমার এইসব সন্দেহ শুনে।

'সব অন্য মতলব।'

'যা, ভাগ।'

'আমি এদের ঠিক জানি।'

'জানিস তো জানিস। যা।'

'ঠকবে।'

'তোকে বলেছে।'

'এসব শালা—'

'মুখ খারাপ করবি না, খবরদার।'

মেজবু আমার কথার কোনো পাত্তাই দিত না। আমিও আর কিছু বলতাম না। আমার কি পেট হলে তো আর আমার হবে না। মাথা হেঁট হলে আমার আগে বড় যারা আছে তাদের হবে। মেজ ভাইয়ের হবে। মুক্তিযোদ্ধা। বড়বুর হবে। মুক্তিযুদ্ধে শহীদের বিধবা। তাদের হবে। আমার কি? তারা বললেই পারে মেজবুকে? বলে না কেন? আমি বুঝি না কেন বলে না? খুব বুঝি। একটা প্রেম ট্রেম করে নিখরচায় যদি বিয়েটা হয়ে যায়, দায়িত্ব চুকে গেল। ঝামেলা ভোগ করতে হলো না। খুব বুঝি। মেজ ভাইয়ের মেজাজ যে এত খিটখিটে, সব সময় চড়েই আছে, মেজবুকে দেখলে তো দিব্যি হেসে গলে যান। কেন? বুঝি না?

হলোও তাই। মেজবুর বিয়ে হলো যার সঙ্গে, সেও একদিন দেখা দিল গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে। তার দৌলতে বেশ কয়েকবার চাইনিজ হয়ে গেল বাড়ির সকলের। মিঠুয়া তো সকলের আগে নাচতে লাগল, এমন চমৎকার লোক আর হয় না। লোকটিও বা কি মন্ত্র করল মেজ-বুকে, সিনেমা ভুলে তাকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠল।

ঠিক তখন যা হবার তাই। নাটকের স্ক্রিপট করাই আছে। শুধু অভিনয় করে যাও।

মেজ ভাইকে একদিন মেজবু বলাল। মিঠুয়া উকিল। মিঠুয়া গিয়ে বলল, 'মামা, খালা বিয়ে করবে।'

'কাকে?'

কাকে আবার ? এ সব তো জানা শোনা নাটক। পাত্র-পাত্রী সকলেই চেনে। শুধু দর্শকের সুবিধার্থে না চেনার ভান করতে হয়, যাতে প্রশ্নের মাধ্যমে সব কিছু খোলাশা হয়ে যায়।

মেজবুর পছন্দ করা বরটির নাম শুনে মেজ ভাই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

'কক্ষণো নয়। নেভার। আমি বেঁচে থাকতে নয়।'

নাটকের এ সংলাপও অচেনা নয়।

'জানা নেই, শোনা নেই, একটা রাস্তার বখাটে বাঁদর ছেলের হাতে বোনকে আমি তুলে দেব না।'

কথাটা কিন্তু ফাঁপা, নড়বড়ে। দুনিয়ার সবার সঙ্গে সবার কিছু জানা শোনা হয়েই থাকে না। জানাশোনা করে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে জানা শোনা করে নিলেই হয়। অসুবিধা কি ? তারপরে যে সব বিশেষণ প্রয়োগ করা হলো—বখাটে, বাঁদর—এগুলো বড় ব্যাকডেটেড, আজকাল চলে না, পুরনো নাটক বা কলকাতার পুরনো দিনের সিনেমায় ছাড়া শোনা যায় না।

মেজভাই আরো বললেন, 'ওকে বলে দিস, মিঠু। বিয়ে করতে হলে আমার লাশের ওপর দিয়ে যেতে হবে।'

সত্যি কথা বলতে কি, এসব সংলাপ না নাট্যকার, না অভিনেতা, না দর্শক কেউই আজকাল সিরিয়াসলি নেয় না। মিঠুয়া পর্যন্ত শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল। ওর আর বয়স তখন কত সাত-ফাত হবে। আজকাল ঐ বয়সেই, বিশেষ করে মেয়েদের, জ্ঞান বড় টনটনে হয়। আমি দেখেছি। দেখিনি ? সুরাইয়ার তখন কত হবে তেরো চোদ্দ আমারও অবশ্য আঠারো, কিন্তু তখুনি আমার কবিতা ছাপা হয় সংবাদে, বিচিত্রায়, কবিতা পড়ি একুশের ভোরে বাংলা একাডেমিতে। সেই তেরো চোদ্দ বছরের সুরাইয়া, তখনো তার ওড়না পড়লেই কি না পড়লেই কি, একা আমার ঘরে আমি টেবিলে বসে লিখছি, আমার পাশে দাঁড়িয়ে গা ঘেঁষে আসে, খপ করে টেবিলে কুনুই নামিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'আমাকে একটা কবিতা লিখে দেবেন ? প্রেমের কবিতা তার বান্ধবীর মামা আমি, আমাকে 'মামা' পর্যন্ত বলা নয় বুঝুন।

যাকগে, শেষ পর্যন্ত নিখরচায় বিয়েটা হয়ে গেল। নিখরচা মানে আক্ষরিক অর্থে এক পয়সাও খরচ করতে হয়নি। মেজবু বাইরে গিয়ে

বিয়ে করে এসেছে।

বিয়ের আগে দুলাভাই খুব আশা দিয়েছিল মেজবুকে সিনেমায় নামিয়ে দেবে। রাফিয়া, এই দুটো দিন অপেক্ষা করো, পরিচালক লোকেশনে গেছে, ফিরে আসুক। রাফিয়া, এই ছবিটা প্রডিউসারের বড় খারাপ গেছে, একটু সামলে উঠুক, তারপরে তোমাকে চান্স দেবে বলেছে। এই ওই করতে করতে বিয়েই হয়ে গেল। বিয়ের পর সিনেমার কথা বেমালুম চেপে গেল দুলাভাই। যা আমি ভেবেছিলাম। আমার তখনই মনে হয়েছিল, মেজবুকে একবার ঘরের খাঁচায় ঢোকাতে পারলে আর বেরুতে দেবে না। একেকটা লোকের প্রেম মানেই মালটিকে হস্তগত করা। ঢের দেখেছি।

প্রেম মানে আমি এখনো বুঝে উঠি না—কি? কাউকে অধিকার করা? কারো সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখা? নিজের যা নেই কারো ভেতরে তা আবিষ্কার করা কি? কোনটা? অথবা অন্য কিছু?

নাকি, সুন্দর একটি মুখের নিচে ভরাট একটি দেহ?

ওই? ওতেই?

কবি ইব্রাহিমের বড় ভাই আখতার মুসা, চিত্র পরিচালক, আমাকে একাধিকবার বলেছে, প্রেম একটা কমোডিটি। সেনা পাউডার শাড়ি প্রেসার কুকার, এ সবের মতোই আরো একটি পণ্য হচ্ছে প্রেম।'

সেই আখতার মুসার কাছে গেছে রাফিয়া আমার মেজবু? শেষ পর্যন্ত?

তার স্বামী কি অনুমতি দিয়েছে নাকি সে জানেই না? নাকি, দু'জনের ভেতরে অনুমতি নেয়ার আর কোন তোয়াক্কাই নেই?

আমি একটা ঝামেলার ভেতরে পড়ে যাই। আমার আরো মনে পড়ে যায়, আরো কিছু। ইব্রাহিমের কাছেই শুনেছি।

'মুসাভাইয়ের টেকনিক জানিস ফিলমে নামবার জন্যে মেয়ে এলেই প্রথমে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কাপড় তোলার অভ্যেস আছে?'

আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। আখতার মুসা যদি আমার বোনকে বলে থাকে? কিন্তু পর মুহূর্তেই রহস্যময় এক চিকিৎসা হয়ে যায়। আমার কান শীতল হয়ে যায়। মেজবুকে আমার আর নিজের মায়ের পেটের বোন বলে মনে হয় না। একটি মানুষ। জীবনে সে যা চেয়েছিল তা পেতে চলেছে। পাক। আমার অসুবিধে কি?

রাস্তা দিয়ে দেখতে পাই কয়েকটা লোক প্রকাণ্ড এক ব্যানার কাঁধে

করে নিয়ে যাচ্ছে। সিনেমার ব্যানার। নতুন কোনো বই মুক্তি পাচ্ছে। রাফিয়া, আমার মেজবুর মুখ এক দিন এইসব ব্যানারে তা হলে আঁকা হয়ে থাকবে। মাঝরাতে সেই মুখ মানুষেরা বহন করে নিয়ে যাবে ঘুমন্ত নগরীর ভেতর দিয়ে।

৫

আমরা পাঁচ ভাইবোন। আমাদের পাঁচজনের মাঝখানে আরো দু'-চারজন ছিল তাদের কেউ জন্মের আগেই নষ্ট গেছে, কেউ জন্মের সামান্য পরেই। এই নষ্ট ফলগুলোর কথা মা খুব গল্প করতেন বলে শুনেছি। মা যখন যান, আমার সাত বছর বয়স। মায়ের সাক্ষাত কোনো কথা বা স্মৃতি আমার নেই। শুনেছি, মেজবুর পরে আর আমার আগে তিন তিনটি ফল নষ্ট হয়ে যায়। মেয়ে ছিল তিনটিই। মা নাকি বলতেন, তিন পরী। বলতেন, কোনো কারণে তিন পরী অপরাধ করে-ছিল, তার শাস্তি হিসেবে মানুষের গর্ভে তাদের পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেই তিন পরীর পরে আমি। আর আমিই শেষ। আমার দু'বছর বয়সে বাবা চলে যান। বাবার চলে যাওয়াটা নাকি ছিল খুব শান্ত, খুব নীরব। যেন অপিসে যাচ্ছেন। তখন আইয়ুব খাঁর আলম। পাকিস্তান ভারত এক দফা যুদ্ধ হয়ে গেছে। পাকিস্তান হেরেছে। তাসখন্দে গিয়ে সন্ধি। তাসখন্দে লাল বাহাদুর শাস্ত্রি হঠাৎ হার্টফেল করলেন। তারপর পরাজয়ের গ্লানি কাটাতে আইয়ুব খাঁ শুরু করল তার উন্নয়নের এক দশক পূর্তির উৎসব। আপনাদের মনে পড়ে এসব আমি শুনেছি মেজভাইয়ের কাছ থেকে। সে তখন থেকেই রাজনীতি ঘেঁষা। তখনই তার ইচ্ছে সাংবাদিক হবে।

আইয়ুবের সেই দশক পূর্তির তোড়জোড়ের সময় অফিস বড় কড়া-কড়ি ছিল। এক মিনিট লেট হলেই, বাপ, বিরাট ঝামেলা। বাবা খুব ভোরে উঠেই রওয়ানা হয়ে পড়তেন। ওয়ারীতে আমাদের বাড়ি থেকে

সেক্রেটারিয়েট, তিনি হেঁটেই মেরে দিতেন। সেদিন তিনি ভোরে উঠেছেন, হাত মুখ ধুয়ে ওজু করে নামাজ পড়েছেন, নাশতা করেছেন, তারপর বললেন, 'এখনো টাইম আছে। একটু রেস্ট নিয়ে নি।' শুয়ে তিনি চোখ বুঁজলেন, সেই শেষ। না ব্যথা, না শরীর খারাপ, না চিৎকার, না মুখে গ্যাঁজ, কিচ্ছু না। লোকে নাকি লাল বাহাদুর শাস্ত্রির কথা বলত। ঠিক সেই রকম। লাল বাহাদুর আইয়ুব খাঁনের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে সন্ধিপত্রে সই-টই করে ভালো মানুষ শুতে গেছেন, সেই শেষ শোয়া। আমার বাবা যেন বেহেশতে নয়, অপিসে গেছেন, সেই শেষ যাওয়া।

এখন, এই মুহূর্তে জীবিতদের কথাই যদি ধরতে হয় তো পাঁচ ভাই বোনও বলা উচিত নয়, চার ভাই বোন। ভাইয়ের মধ্যে আমরা ছিলাম তিনজন—আনোয়ার, মনোয়ার, সানোয়ার অর্থাৎ আমি; বোনদের মধ্যে দু'টি—শাফিয়া, রাফিয়া। একাত্তরে আনোয়ার রাজাকারদের হাতে মারা যায়, তার সপ্তাহ দুয়েক আগেই মিলিটারীর হাতে ধরা পড়ে চিরদিনের মতো নিখোঁজ হয় বড়বু শাফিয়ার স্বামী। এক মেয়ে মিঠুয়াকে নিয়ে বড়বু চলে আসে আমাদের বাড়িতে। সেই থেকে আছে।

আরো একটু সাজিয়ে গুছিয়ে বলি। প্রথমেই, আমাদের পাঁচ ভাইয়ের কে বড় কে ছোট। আনোয়ার, শাফিয়া, মনোয়ার, রাফিয়া, সানোয়ার। বড় ভাই বেঁচে থাকলে এখন তার বয়স হতো চল্লিশের মতো; আমি, সবার ছোট, আগেই বলেছি, বাইশ। বড় ভাই বিয়ে করেছিলেন না, মেজভাই আজো অবিবাহিত, আর আমি তো বিয়ের কথা এখনো চিন্তাই করতে পারি না। প্রেমের একটু শখ ছিল নানা রকম পড়ে-টরে শুনে-টুনে। কিন্তু জিনিশটা ঠিক কি বা কেমন না জেনে এগোনোটা আমি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে আমার ভাই-বোনদের ভেতরে একমাত্র বিয়ে হয়েছিল বড়বু শাফিয়ার। শুনেছি, বাবা খুব ধুমধাম করে বিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ির প্রথম বিয়ে। দুলাভাই খুব ভালো ছিল। মেজভাই তো এখনো খুব প্রশংসা করে; মানে, যখন তার মেজাজ ভালো থাকে এবং পুরনো দিনের কথা বলতে ইচ্ছে করে তখন সে বড় দুলাভাইয়ের কথা অনেকখানি বলে।

শুনেছি, দুলাভাই গোপনে মুক্তিবাহিনীর হয়ে কাজ করছিল।

সে ছিল এনজিনিয়র, বিদ্যুতের লোক। ভারতে যায়নি, দেশের ভেতরেই ছিল। ভেতরে থেকেই বড় রকম ভূমিকা নিয়েছিল। কোথায় নাকি একটা বড় ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দিয়েছিল কি দেবার কথা ছিল। পনেরো বছরেই এসব পনেরো শতাব্দী আগের কথা হয়ে গেছে। ঠিক-ঠাক কিছু জানা যায় না এখন। বড়বুকে জিজ্ঞেস করেছি।

'আমি কি জানি? আমি কি জানতাম ও তলে তলে এইসব করছে?'

'তোমাকে বলেনি?'

'না।'

আমার ধারণা, দুলাভাই বড়বুকে বলেনি তার একমাত্র কারণ, বললে বড়বু বাধা দিত। সব সময় সবাই তো আর নিজেকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে দেখতে পায় না।

দুলাভাইকে মিলিটারীরা ধরে নিয়ে যায়। বড়বু তখন মিঠুয়াকে কোলে নিয়ে দুলাভাইদের দেশের বাড়িতে আছে। তার কাছে খবর যায়। দুলাভাইয়ের বড় দু'ভাই আশুগঞ্জে, যেখানে দুলাভাই কাজ করত, গিয়ে খোঁজখবর করে। মিলিটারী বলে, আমরা জিজ্ঞেসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছি, তার পরে সম্ভবত ইন্ডিয়া চলে গেছে। মিলিটারী যখন বলে—কেউ ইন্ডিয়া চলে গেছে, তার মানে সে আর বেঁচে নেই। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

তবু আশায় আশায় ছিল বড়বু। সাত আট দশ বছর পর্যন্ত বলত, হয়ত ফিরে আসবে। এখন আর বলে না। এখন আর একেবারেই বলে না। পাথর যত ভারীই হোক, পানিতে তলিয়ে যেতে কোনো কোনো পাথরেরও অনেক সময় লাগে।

স্বাধীনতার পর বেশ কিছু টাকা পেয়েছিল বড়বু দুলাভাইয়ের দরুন। নানা রকম সূত্র থেকে টাকা এসেছিল। আমি জানি, অনেক মুক্তিযোদ্ধা বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু বড়বুকে কখনো বলতে শুনিনি, যে, সে কিছুই পায়নি। বরং বড়বু বলে; যতই দিক মানুষটাকে তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

দুলাভাইয়ের ভাইয়েরা ছিল বেশ গরীব—একজন মোক্তার, একজন মাস্টার, একজন দোকানদার, একজন কৃষি কাজ করে। বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন পাত্র দেখে, পাত্রের পরিবারের আর্থিক অবস্থা দেখে নয়। তার ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী, সবচেয়ে সফল ছিল আমার দুলা-

ভাই। আমার মনে হয় এর জন্যে দুলাভাইয়ের মনে একটা অপরাধ বোধ ছিল। অনেক সময় এটা হয়। ভাইদের একজন জীবনে খুব ভালো করলে এটা মনেই হতে পারে, তার এবং অপরের কাছেও, যে, সে আর সব ভাইদের এক ধরণের শোষণ করে হরণ করে বড় হয়েছে।

আমার মনে হয় দুলাভাই এই অপরাধবোধের কথা বড়বুর সঙ্গে আলোচনা করতেন। বড়বুর কোনো কোনো কথায় কখনো কখনো আমি এটা টের পেয়েছি। স্বাধীনতার বছর খানেক পরে, দুলাভাই-য়ের দরুন, বড়বুর হাতে তখন কয়েক লাখ টাকা। বড়বু সেই টাকা থেকে তার ভাশুর দেওরদের নামে জমি কিনে দেয়, দোকানে পুঁজি লাগায়, সবার নামে কিছু কিছু ব্যাংকে জমা রাখে। ব্যাপারটা ভালো চোখে দ্যাখে না বড়বুর জায়েরা। তারা সচ্ছলতা ভোগ করে ষোলো আনা কিন্তু ঐ সচ্ছলতার পেছনে যে মানুষটির উদারতা রয়েছে তাকে পদে পদে বিড়ম্বিত লাঞ্ছিত করতে থাকে। মানে মানে সরে আসে বড়বু। শরৎচন্দ্রের আরেকখানা অলিখিত উপন্যাস হয়ে ওঠার আগেই বড়বু মিঠুয়াকে নিয়ে ঢাকায় আমাদের বাড়িতে, তার বাপের বাড়িতে চলে আসে।

আসলে তাকে নিয়ে আসে মেজভাই। প্রায় পিঠোপিঠি দু'জনে, বছর দেড়েকের ছোট বড়।

'তোমার থাকতে হবে না ঈশ্বরদিতে। অকৃতজ্ঞ, ছোট লোক সব। তুমি চলো।'

আসবার সময় নাকি ঈশ্বরদির বাড়িতে চার ভাইয়ের চার ঘরে সারা রাত ঝগড়া শোনা গিয়েছে। কোন ভাই চায় আমার বড়বু থেকে যাক, তার বউ চায় না; আবার আরেক ঘরে হয়ত বউ চায় বড়বুকে হাতছাড়া না করতে, তার স্বামী ভাবছেন অন্য প্রকার। সে এক নাকি কাণ্ডই। মেজভাই বড় বেশি হাসে-টাসে না। কিন্তু যখন এই ঘটনা বলে, একেবারে হো হো করে হাসতে থাকে। আমারই একেকবার মনে হয়, পাগল হয়ে গেল না তো। যে হাসি।

মেজভাইয়ের ঐ রকমই। কিছু বোঝা-টোঝা যায় না। ছকে ফেলা যায় না। খুব ভীরু মানুষ। কিন্তু একাত্তরে যুদ্ধে গিয়েছে। সামনা-সামনি লড়েছে। মেজাজ খুব রুক্ষ, কিন্তু সামান্য কোনো কথায় এমন হাসবে যে সুস্থ মনে হবে না। মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে দেশ স্বাধীন করে ফিরে এসেছে আবার সাংবাদিকতায়, এবং এখনো চাকরির দিক থেকে

তৃতীয় চতুর্থ ধাপের সাংবাদিক—কিন্তু এ নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কত রকম রাজনীতি, তাদের খাটো করবার কত রকম চেষ্টা, তাদের অসুবিধেয় ফেলবার কত রকম ঘটনা ঘটছে একের পর এক, কিন্তু আমার মেজভাই, মুক্তিযোদ্ধা মনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া চূড়ান্ত আশাবাদী, চিকিৎসার অতীত আশাবাদী। তার মুখের কথা শুনে মনে হতে পারে যে বাস্তবের সঙ্গে আদৌ তার যোগ নেই, নইলে এই বাজারে এত আশাবাদ কি করে সম্ভব ?

'আমি তোদের মতো পেসিমিষ্ট নই। আজ না হয় কাল হবে। কাল হবেই হবে।'

'কাল যদি না হয়

'পরশু। পরশু না হলে তরশু। সময় কি ফুরিয়ে যাচ্ছে ? ইতিহাস নিয়ে এত তড়বড় করলে চলে না। এত যে চেল্লাছিস, হাজার বছরের দূরত্বে দাঁড়িয়ে, ভবিষ্যতে, আমাদের এই সময়ের দিকে তাকালে দেখবি, এই সময়টাকে ঐতিহাসিকেরা হয়ত সেই বৃটিশ আমলের মধ্যেই ধরে রেখে দিয়েছেন, ঔপনিবেশিক আমলের ভেতরেই আমরা হয়ত এখনো রয়ে গেছি। স্বাধীনতা-টাধীনতা কি বলছিস তোরা ? রাতারাতিই সব হয়ে যায় ? এই তোদের ধারণা ?'

ইতিহাসকে, অতীতকে, বর্তমানকে, একটু অন্য চোখে দ্যাখে মেজভাই। খুব বড় মাপের জমিতে ফেলে দ্যাখে। আমার এসব পোষায় না। আমার ওটা রোমান্টিক ধাঁচের ভাবনা চিন্তা বলে মনে হয়। কিন্তু মেজভাই আমাকে বলে, 'আসলে তুই হচ্ছিস স্বার্থপর নাম্বার ওয়ান। নিজের নাকের চারপাশ ছাড়া কিছু দেখতে চাস না। একটু দাঁড়িয়ে দ্যাখ। একটু এগিয়ে দ্যাখ।'

এই মেজভাই কাজ করত সংবাদে। মিলিটারী একাত্তরে জ্বালিয়ে দিল সংবাদ। মেজভাই তখন অফিসে ডিউটি করছে। শুনেছি মার সঙ্গে দেখা না করেই মেজভাই চলে যায় ইণ্ডিয়ায়। পত্রিকা অফিস থেকেই আর ফেরেনি সে পরাধীন বাংলাদেশে তার নিজের বাড়িতে। পরে অবশ্য মায়ের মৃত্যুর জন্যে এই তার হৃদয়হীনতাও দায়ী—এরকম বলবার চেষ্টা হলে মেজভাই বলতে চায়, যে, বাড়ি ফেরার কোনো কায়দাই ছিল না। নবাবপুরে সারা রাস্তায় লাশ, মিলিটারী মেশিনগান-ট্যান নিয়ে টহল দিচ্ছে, চারদিকে আগুন জ্বলছে; হলোই বা বংশাল থেকে ওয়ারী একটুখানি পথ, ঐ পথই কি তখন পাড়ি দেয়া সোজা কথা ? অতএব,

বাড়িতে খবর না দিয়ে বা দেখা না করেই তাকে ইন্ডিয়া চলে যেতে হয়।

খুলনা রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিল মেজভাই। কিন্তু সে তো আরো পরের কথা ইন্ডিয়া যাবার মাসখানেকের ভেতরেই পরিচিতদের কেমন একটা জান জানি হয়ে যায় যে, মনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া ইন্ডিয়ায় ট্রেনিং নিচ্ছে, মুক্তিবাহিনীর ভেতরে বেশ জায়গা করে নিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের মা নাকি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতেনই কখন মেজ-ভাইয়ের গলা শুনবেন সেই আশায়। মা বড়ভাই এদের ধারণা ছিল, মেজভাই যেহেতু সাংবাদিক কাজেই তার কাজের ক্ষেত্র হবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। কিন্তু সে ধারণা ভুল প্রমাণ করে মেজভাই বন্দুক হাতে তুলে নেয়।

একদিন রাজাকারের একটা দল আসে বাড়িতে। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমাকে নাকি তখন ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হতো, সেই একাত্তরের দিনগুলোতে। তারা এসে জিজ্ঞেসাবাদ করতে শুরু করে। তার কয়েকদিন আগেই মিলিটারীরা আশুগঞ্জে ধরে নিয়ে গেছে দুলাভাইকে। মনে করা হয়, দুলাভাইয়ের ব্যাপারেই খোঁজ করতে এসেছে। অথবা মেজভাইয়ের ব্যাপারে। কিছুই এখন আর স্পষ্ট জানা যায় না। সঙ্গত কারণ আছে। তখন বাড়িতে মানুষ বলতে আমি, মা, মেজবু, বড়ভাই। মেজভাই ইন্ডিয়ায়, বড়বু তার শ্বশুর বাড়ি ঈশ্বর-দিতে। বাড়িতে যে আমরা চারজন, তার ভেতরে আমি ভেতরের ঘরে ঘুমিয়ে, আমার খাটের নিচে গা-ঢাকা দিয়ে আছে মেজবু, বাইরে রাজা-কারদের সঙ্গে আমার বড়ভাই আর মা। বৈঠকখানাতেই গুলি করে খুন করা হয় বড়ভাইকে। তার লাশ পড়ে যায় ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের দেয়ালে। এখন সেখানে ছোট একটা জলচৌকির ওপর পাতা আছে আমার মায়ের জায়নামাজ। বহু পরে বড়বু যখন এ বাড়ি আসে, ঐ জায়গায় জায়নামাজটা পাতে সে-ই।

বড়ভাই মারা যাবার কয়েকদিনের ভেতরে হার্টফেল করে মা। বাড়িতে থেকে যাই আমরা দু'টি প্রাণী– সাত বছরের আমি, আর চৌদ্দ বছরের রাফিয়া আমার মেজবু। মেজবুর কাছে শুনেছি, আমাদের নাকি আশ্রয় দেবার মতো লোক ছিল না। তার ওপরে সবাই জানে, মেয়েদের ওপর ওরা চালাচ্ছে পাশবিক অত্যাচার। রাফিয়াকে কেউ রাখতে চায় না; যদি রাফিয়ার লোভে মিলিটারী কি রাজাকারেরা আসে? আর সেই সঙ্গে আশ্রয়দাতার বাড়ির দুটি একটিকেও নিয়ে চলে

যায় ? বলেছি তো, আমার মেজবু অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। ওর ঐ রূপ ওকে আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে রাখে।

এখন আমার ভাবতে অবাকই লাগে, মেজবুর মতো আপনখুশি মানুষ, সে কেমন করে পাঁচ পাঁচটা মাস আমার মতো অপোগন্ড একটাকে নিয়ে ওয়ারীর মতো জায়গায়, যে জায়গার চারপাশে বিহারীদের মহল্লা, সেখানে ছিল ?

'ছিলাম। ঐ ছিলাম আর কি। আল্লা ভরসা করে ছিলাম।'

এর বেশি মেজবু আর কিছু বলতে পারে না।

কোনো কোনো স্মৃতি এত কষ্টের যে মন নিজে থেকেই তা ভুলে যায়, অস্পষ্ট করে নেয়; নইলে জীবন যাপন দুঃসহ হয়ে যাবে যে। কিন্তু এটা ব্যক্তির পক্ষে সত্য হতে পারে, সমষ্টির পক্ষে কি ? জাতি কি ভুলে যেতে পারে তার ইতিহাস ?

৬

রাত এখন সাড়ে ন'টা। এত সকালে কারো ঘুমিয়ে পড়ার কথা নয়। বিশেষ করে আমাদের এটা তো বিয়ে বাড়ি। মিঠুয়ার আজ গায়ে হলুদ হয়ে গেল না ? কিন্তু মনে হচ্ছে দশ হাত পানির তলায় নিঃশব্দে ডুবে আছে সবকিছু।

খাওয়া হয়নি আমার। রান্নাঘরে যাব, তার আগেই পড়ে খাবার এক-দিক খোলা জায়গাটা। দেখি, ফ্রিজের খোলা দরোজার সমুখে মেজভাই কি একটা নিয়ে খুব পরিশ্রম করছে।

'আরে, তুমি অপিস যাওনি ?'

মেজভাই ঘুরে দাঁড়ায়। হাতে প্রকান্ড এক রুই মাছ। মাছের গায়ে লাল নীল ফিতে জড়ানো।

আমি হাঁ হয়ে যাই। কোনো রকমে উচ্চারণ করি, 'মাছ।'

'মাছ।' বলে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে মেজভাই মাছটি নামিয়ে রাখে মেঝেয়। 'মিঠুয়ার গায়ে হলুদের মাছ। মুখের ভেতরে মোহর ছিল। মিঠুর বন্ধু ঐ মেয়েটার কাছে আছে।'

'মোহরটা তো ?'

'আরে হ্যাঁ, বাবা, মোহর। সোনার জিনিস। কে রাখে ? সেও তো ছেলেমানুষ।'

'সুরাইয়া। ওর কাছে ?'

'বোধ হয়। সুরাইয়াইতো। ঐ তো নিয়ে নিল।'

আমি অবাক হয়ে যাই, মেজভাইয়ের প্রশান্ত মেজাজ দেখে। রাগ

ঝাল নেই। ঠাণ্ডা। এই তো এতক্ষণ আমাকে বকছিল। হঠাৎ গোলাপ পানি পড়ল কি করে? কোত্থেকে?

প্রশান্ত মেজভাইকে অস্বাভাবিক মনে হয়। বড় অচেনা বোধ হয়। ক্ষেপিয়ে দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে কেমন করে মানুষটা তার স্বভাবিকতার ভেতরে ফিরে আসে।

আমি বলি, 'তোমার ন নাইট শিফট তখন বললে?'

মেজভাই মাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় না। একদৃষ্টে তাকিয়েই থাকে। অনেকক্ষণ পরে স্বপ্নের ভেতর থেকে যেন তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, 'বলেছিলাম নাকি? বলেছিলাম?'

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায়, মেজভাইয়ের কিছু একটা হয়েছে। খুব সংঘাতিক কিছু। মানুষটা যে একেবারেই বদলে গেছে।

মেজভাই বলে, 'শুধু কি মাছ? দই। মিষ্টি। পান। সুপারি। শাড়ি। কত কি। পার্টিখানাই যদি দেখতিস। সিলেটের খাস শীতল পার্টি। কি নকশা কি বাহার। অবশ্য বাজে খরচা। একদিনের বেশি তো আর ও পার্টি কাজে আসবে না কে বসবে ওতে? বল।'

আমি এখনো কোনো হদিশ পাই না। হাল ছেড়ে দিই। ক্রমশ প্রকাশিত উপন্যাসের মতো ভবিষ্যতের হাতেই ছেড়ে দিই মেজভাইয়ের বর্তমান ভাবমূর্তিটিকে।

'তো মুশকিল হয়েছে এই মাছ নিয়ে।' মেজভাই চিন্তিত মুখে মাছটিকে নিরীক্ষণ করতে করতে বলে, 'এত বড় মাছ, কে কোটে? মানুষ কে আছে? তোর বড়বু। সে নামবে না। মেয়ের বিয়ে, মা মান করে আছেন। মেয়ে তো পালিয়ে গিয়ে কোর্টেও বিয়ে করতে পারত। পারত না?'

'হুঁ। খুব।' আমি সায় দিই। এবং মনে মনে অবাক হই সত্যিই তো, মিঠুয়া এত ঝামেলা না করে আদালতে গিয়ে বিয়ে করে নিলেই পারত।

'সে যে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করেনি, বংশের মুখে চুনকালি দেয়নি, ভাগ্য বলে মানো। তা মানবে কেন? তুমি ঘরে খিল দিয়ে থাকবে। এখন এসব সামলায় কে? এ মাছ কোটে কে?'

'মুশকিল।' আমি ডানে বাঁয়ে কোনোদিকে পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে নিরপেক্ষ মন্তব্য করি।

'তাই মাছটাকে ফ্রিজে ঢোকাবার চেষ্টা করছিলাম। ঢোকে? এত

বড় মাছ এইটুকু ফ্রিজে ঢোকে ? দুটো তাকই খুলে নিয়েছি, তবু জায়গা হচ্ছে না।'

'মাছ রাখলে তো রাখতে হয় ওপরের কম্পার্টমেন্টে। নিচের তাকে রেখে লাভ কি ? থাকবে না।'

'পচে যাবে বলছিস ? সে বুদ্ধিও করে রেখেছি। ওপরের কম্পার্টমেন্টের ডালাটা খুলে রাখব। তখন গোটা ফ্রিজটাই ধরগে ডিপ ফ্রিজ হয়ে যাবে।'

আমি আঁতকে উঠি।

'সর্বনাশ। এতদিন পয়সা জমিয়ে এত কষ্ট করে একটা ফ্রিজ কেনা হয়েছে, এ বাড়িতে লাকসারী বলতে ঐ একটাই, ঠান্ডা পানি—দিতে তুমি বারোটা বাজিয়ে। পুরো ডিপ ফ্রিজ হতো, না, হাতী। পুরোটা বিগড়ে যেত।'

'তাহলে ? রাফিয়ার আক্কেলখানাও তেমনি। এলি গায়ে হলুদে, বসে যা, আজকের দিনটা থেকে যা। তা নয়, মেয়ের মাথায় হলুদের একটা ছোপ দিয়েই হাওয়া।'

মেজবুর কথা মনে পড়ে যায়। বাড়িতেও যায়নি, এখানেও নেই, চিত্র পরিচালক আখতার মুসা লোক ভালো নয়—বিপদ না বাধায়।

কথাটা মেজভাইয়ের কাছে ভাঙ্গব কিনা বুঝে উঠি না। বলা উচিত ? বলা উচিত হবে না ?

মেজভাই আমাকে ধমক দিয়ে ওঠে, 'চুপ করে আছিস যে। বুদ্ধি দে। মাছের কি হবে।'

আমিও ঈষৎ গরম হয়ে বলি, 'মাছের কি হবে শুধু নয়, এত মাছ খাবেই বা কে ? রাঁধবে কে ? নাহ, মিটুর বড্ড বাড়াবাড়ি। বাড়িতে বিয়ে করতে শখ, বাড়িতেই তো হচ্ছে। তার এত ফরমালিটি কিসের ? গায়ে হলুদ, মাছ, মোহর। যতো সব।'

ধৈর্য ধরে আমার মেজাজ নিরীক্ষণ করে মেজভাই। আমি যথেষ্ট শীতল হয়েছি ধরে নিয়ে এবার বলে, 'তুই বরং তোর বড়বুর কাছে একবার যা। এসব মেয়েদের কাজ। আমরা কি পারি?'

আমিও এছাড়া পথ দেখি না। উঠতে যাবো, আরেকবার ঝ দেখাতে রেয়াত করি না। বলি, 'এ তবু গায়ে হলুদ। পরশু বিয়ে। তখন যদি সব ভেসে না যায় তো কি বলেছি।'

'যাবে না।'

'যাবে না মানে ? তুমি ঠেকাবে ? কি করে ? শুনি। বলো।'

'সে তোর চিন্তা করতে হবে না।'

'চিন্তা করতে হবে না ? বকাবকি তো শেষে তুমি আমাকেই করতে থাকবে।'

'তোকে কেন বকব ?'

'না, আমাকে বকবে না। তবে হাতের কাছে লোক পাবে না তো, আমাকেই পাবে, আমাকেই শুনতে হবে।'

'বললাম তো তোর চিন্তা নেই। মনসুর সায়েব লোক পাঠিয়েছিল।'

'মনসুর সায়েব ?'

এক মুহূর্তের জন্যে আমার ঠিক মনে পড়ে না যে ব্যক্তিটি কে।

'আরে, মিঠুর জামাই।'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো। লোক পাঠিয়েছিল কেন ?'

'তোর মনে নেই ?'

'কি ?'

'মিঠু যখন এসে বলল, বাড়িতে বিয়ে হবে।'

আমি অসহ্য হয়ে চাপা গলায় হিসহিস করে উঠি, 'পাগল হয়ে যাব, ষোলো বছরের ডেঁপো মেয়ে এসে বলে, মামা, বিয়ে করব, মামা, বাড়িতে বিয়ে দিতে হবে। আর তোমরাও বুড়ো ভাম কান পেতে তাই শোনো। আর তুতু করে তাই করো ?'

'কেন করব না ? আমাদের কি ? আমাদের ক্ষতিটা কোথায় ? একটু ঝামেলা, গতরে খাটতে হচ্ছে ? তা না হয় একমাত্র ভাগনির জন্যে খেটে দিলাম।'

'আর টাকা পয়সা ? উড়ে আসছে ?'

'ইয়ে, তোকে বলিনি ? সেই কথাই তো বলতে চাইছি। তুই বলতে দিচ্ছিস কোথায় ?'

'বলো।'

'মিঠু যখন এসে বলল, বাড়িতে বিয়ে, আমি বললাম, সে অনেক খরচ, আমি সাংবাদিক মানুষ, আমি এত পারব কি করে ?' বলে, একটা বিয়ে পর্যন্ত পোষাতে পারব না বলে করছি না।'

আমি জানি মেজভাইয়ের এটা ডাহা বাজে কথা। পোষাতে তিনি ঠিকই পারেন, করবেন না, এই হচ্ছে ব্যাপার। কেন করবেন না ? কোথায় কবে একটা ছ্যাঁক খেয়েছেন, কোন এক পাষাণী তাকে বিয়ে করেছে, তার

স্মৃতি তিনি পুজো করবেন, তার স্মৃতি বুকে নিয়ে কবরে যাবেন, আর কাউকে হৃদয় দেবেন না। মামলা এই এবং এই পর্যন্ত। বলার সময় বলছেন, পোষাতে পারি না বলে বিয়ে করিনা।

আমি অসহিষ্ণু গলায় বলি, 'তারপর বলো।'

'তারপর আর কি ? মনসুর সায়েব খরচ দিচ্ছে।'

'কে ?'

'মনসুর, মনসুর, মিঃ মনসুর, মিঠুর জামাই।'

'বলো কি ?'

'খুব যে ছিছি করছিস। একটা বিয়ের খরচ জানিস ? কত খরচ পড়ে আইডিয়া আছে ?'

'তাই বলে জামাইয়ের কাছ থেকে ? মিঠু তাই অ্যালাউ করল ?'

'না করলে বিয়ে বাড়িতে হতো না। কোর্টে গিয়ে করতে হতো।'

'তাই করলে পারত।'

'কিন্তু শখ যে বাড়িতে বিয়ে হবে।'

আমি হঠাৎ একটা সূত্র দেখতে পাই। বলি, 'মনসুর সায়েব লোক পাঠিয়েছিল মানে ? টাকা পাঠিয়েছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'কত ?'

'যা লাগে। খাওয়া দাওয়া সব মিলিয়ে। ওরাই সব ঠিকঠাক করে ডেকোরেটরকে অ্যাডভান্স ট্যাডভান্স দিয়ে দিয়েছে। বাকি ক্যাশ আমার হাতে দিয়ে গেছে। আমরা হিসেব করে খরচ করব।'

মেজভাইয়ের মেজাজের আকস্মিক প্রশান্তি আর কন্ঠের অপ্রত্যাশিত প্রসন্নতার কারণ এবার স্পষ্ট দেখতে পাই। টাকার ব্যাপারে আমার ভাইটি একটু দুর্বল। দুর্বল মানে অসৎ সে হবে না টাকার জন্যে, নমনীয় হবে কিছুটা। টাকা থাকা না থাকার প্রতিফলন তার মুখে পড়ে। মাসের শেষ দিকে রীতিমতো ঝুনো নারকোল হয়ে যায় চেহারাটা। মাসের প্রথমে বুদ্ধপূর্ণিমার চাঁদ। আজ এতগুলো টাকা হাতে পেয়েছে।

আমি কথাটা দাগিয়ে আবার বলি, 'ক্যাশ দিয়ে গেছে ?'

'এই তো তুই বেরিয়ে গেলি। তার পর পর।'

আমার রাগ হয়। খুব রাগ হয়। আমি মনের ভেতরে কোনো কিছুই নিজের করে অনুভব করি না আর আজকাল। একই সঙ্গে সব

আমার এবং অপরের বোধ হয়। কিন্তু এই টাকার কথায় এখন আগুন ধরে যায়। হয়ত একটু থেমে গেলে আমার চোখে পড়বে, যে, আসলে আমার রাগ করার কিছুই নেই।

কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হয়, মিঠুয়াকে গিয়ে খুব করে দু'চারটে লাগিয়ে দিই।

ষোলো বছর বয়সে চল্লিশ বছরের দোজবরে একটা ষাঁড় বিয়ে করছে, তাও তার কাছ থেকে বিয়ের মেয়ে বাড়ির পুরো খরচ আদায় করে?

মেজভাই আমার জামা টেনে ধরে।

খবরদার।'

'কি খবরদার?'

'ওপরে গিয়ে চেঁচামেচি করবি না।'

আমি ফোঁস ফোঁস করতে থাকি।

মেজভাই আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, 'বড়বুর মতো করিস না। তার না হয় মেয়ে, বাপ মরা মেয়ে, একমাত্র। আমাদের কি?'

'আমাদের কি মানে?'

'আমাদের তো ভাগনি।'

'ভাগনি বলেই কিছু নয়? ভাগনি বলেই দূরের

আমি অবাক হয়ে যাই। মেজভাইকে আমার অচেনা মনে হয়।

'তুমি কেমন হয়ে গেছ। তুমি কি মানুষ?'

আমি চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করি। তবু আমার তৃপ্তি হয় না। আরো কিছু বলতে ইচ্ছে করে। পারি না। আমার মুখে কথা জোগায় না।

আমি হতাশ গলায় উচ্চারণ করি কেবল, 'মিঠুয়া এতদিন আছে। আমাদের কাছে।'

আমি দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাই।

মানুষ কি মানুষের জন্যে অনুভব করা সত্যি সত্যি তবে ভুলে গেছে আমাদের এই বর্তমানে? তার কোনো কিছুতেই আর আপমান নেই, জ্বালা নেই, আগ্রহ নেই, ভালোবাসা নেই; বাড়ি নেই, মাঠ নেই, নক্ষত্র নেই, অমাবস্যা নেই, কিছু নেই, কিছুই নেই?

ওপরে যাবার দুটো দরকার হচ্ছে আমার। গায়ে হলুদের রুই মাছটি যেন বড়বু কেটে তুলে রাখে ফ্রিজে, তাকে পটাতে হবে। আরেকটা দরকার এক্ষুণি, সবার আগে। মিঠুয়াকে জিজ্ঞেস করব, মনসুর

সায়েবের কাছ থেকে টাকা চাইল, চাইতে পারল সে কিভাবে ? এর চেয়ে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করাটাই কি তার জন্যে সম্মানজনক ছিল না ?

মিটুয়ার দরোজা খোলাই আছে। খোলা দরোজা দিয়ে মিঠুয়ার আগে আমার চোখে পড়ে সুরাইয়াকে। এই তো ঘন্টাখানেক আগেও মিঠুয়া ছিল একা। গায়ে হলুদের পর বন্ধুরা সবাই চলে গিয়েছিল। সুরাইয়া আবার ফিরে এলো যে ?

'এই, তুমি কোত্থেকে ?'

ঘরে ঢুকতেও পারিনি, পেছন থেকে ডাক।

'সানো।'

বড়বু ঘর থেকে ডাকে। বারান্দার এই জায়গাটা এমন যে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে সামনে তাকালে মিঠুয়ার ঘর, ডানে আমার, বাঁয়ে বড়বুর। বড়বুর এই ঘরটা অবশ্য কোনো ঘর নয়, বারান্দাই বলা যায়। মিঠু তার একা ঘরের জন্যে খুব ঝুল ধরলে আমিই জায়গাটা ঘিরে দিয়ে বড়বুর থাকবার মতো ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। মেজবুর যতদিন বিয়ে হয়নি, আমার ঘরেই থাকত। মানে, আমিই ওর ঘরে থাকতাম। হ্যাঁ, মেজবুর একটা খবর নিতে হয়।

'কি, বলো।'

বড়বুর পায়রার খোপের ভেতর গিয়ে আমি দাঁড়াই।

'আয়। খেয়েছিস।'

যেন, আজ এ বাড়িতে তার মেয়ের গায়ে হলুদ নয়; যেন, আজ অন্য আর সব দিনের মতোই একটা দিন; বড়বু আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, আমি খেয়েছি কিনা।

আমার চোখে পানি এসে যায়। এই বড়বু নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেয়েছেন মিঠুয়ার ব্যবহারে। মিঠুয়া যাহোক তবু আমার কথাটা কিছু শোনে। আমারই উচিত ছিল অনেক আগেই খুব করে বকে দেয়া, বাধা দেয়া, এ বিয়ের গোড়াতেই শেকড় উপড়ে ফেলা আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু আমি কিছু জানলে তো। মিঠুয়া এত কথা বলে, এত আমার সাথে ভাব, কে জানত আসল কথাটা সে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে, যে, মনসুর সায়েবকে বিয়ে করবার মতো সাংঘাতিক একটা মতলব সে ভাঁজছে।

'না, আমি খাইনি।'

'সে কি ? সে কি কথা

আমি ইচ্ছে করে অভিমানের ঝাঁজ মিশিয়ে বলে যাই, যেন বড়বু টলে যায়; আমি বলি, 'খাবো কি? অ্যাঁ, খাবো কি করে? তুমি খাওয়ার মতো অবস্থা রেখেছ? মেয়ে বিয়ে করছে তাকে বাধা দেবে না, আবার বিয়েতেও থাকবে না, থাকবে না তো অন্যখানে থাকো, তা নয়, বাড়িতেই থাকবে, তিন হাত পরে মেয়ের ঘর, সে ঘরে মেয়ের গায়ে হলুদ হবে, তুমি এখনো খিল দিয়ে থাকবে—এসব পেয়েছ কি, অ্যাঁ? তুমি মনে করছ, আমারই খুব ভালো লাগছে। আমিই খুব তাল দিচ্ছি মিঠুয়ার বিয়েতে। তুমি দেখছ না? গায়ে হলুদ হবে, আমি কেটে পড়েছি, ধারে কাছে পর্যন্ত নেই। টাইম পার করে ফিরেছি? দেখছ না? দেখছ?'

দেখতে হলে তো মানুষকে চোখ দিয়েই দেখতে হয়। বড়বুর দু'-চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে থাকে। আমি মাথা নিচু করে চুপ দাঁড়িয়ে থাকি। একটু পরে আমার পেছনে খুব হালকা করে পায়ের শব্দ পাই। ফিরে দেখতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু ফিরি না। অমন হালকা পায়ের শব্দ মেয়েদের। মিঠুয়া হলে আশপাশে ঘুরত না, সোজা সামনে এসে দাঁড়াত। যে মেয়ে নিজের বিয়ের কথা ষোলো বছরেই বলতে পারে, হবু স্বামীর কাছ থেকে খরচ আদায় করতে পারে, সে হাঁটবে আড়ালে? পেছনে? বাহরে।

তবে, সুরাইয়া। আমাকে কিছু ইশারা করছে? কিছু বলতে চায়?

ফিরে তাকাই। কেউ না। যেই হোক, সে সরে গেছে।

'আচ্ছা।' এই একটা ছোট্ট শব্দ, এই একটা শব্দ যার নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই, আজ পর্যন্ত কোনো কবিতায় যে শব্দটিকে কোনো কবি ব্যবহার করতে পারেনি, সেই শব্দটি—'আচ্ছা'—দীর্ঘশ্বাসের মতো উচ্চারণ করে বড়বু। তারপর কোল ঠেলে নেমে পড়ে চৌকি থেকে। উঠে দাঁড়ায় পায়ের ওপর। সব যেন কাটা কাটা কাজকর্ম। নিঃশব্দে অতঃপর নেমে যায় নিচে। আমি জানি, সে রান্নাঘরে যায়। সে এখন আমার জন্যে খাবার গুছোতে যায়।

আমি একা এইভাবে এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। আমার শরীরের ভেতরে হঠাৎ কেমন শিহরণ বয়ে যায়। আজ সন্ধ্যেবেলায় রমনা উদ্যানের মতো। বালিকাটি যখন আমার ঘাড়ের পাশে ভিজে ঠোঁটে কামড় দিতে গিয়েছিল। জায়গাটা দগদগ করে ওঠে। এর মধ্যেই ঘা হয়ে গেছে যেন। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। বাসায় এসে তখনই সাবান-

টাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত ছিল।

বালিকাটি সমুখের অন্ধকারে শাদা দাঁত বের করে হাসে। তার টক তীব্র ঘামের ঘ্রাণ আমার নাকে এসে লাগে। আমি ওয়াক করে উঠি।

আমি পেট চেপে ধরে ওখানেই দাঁড়িয়ে ভাঁজ হয়ে যাই। ওয়াক। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিই। ওয়াক, ওয়াক।

মিঠুয়া ছুটে এসে আমার পিঠে হাত রাখে।

'মামা, এই মামা।'

আমি তার হাত সরিয়ে দিয়ে নিরস গলায় বলি, 'যা, ঘরে যা, যাহ।'

ও সে রকম মেয়েই নয়। ঘরে যাবে আমাকে দু'হাতে কোমরে বেড় দিয়ে ধরে বলে, 'মদ খেয়েছ

'আহ, ছাড়। ফাজলামো ?'

আমি মিঠুয়ার হাত শক্ত করে ধরে টেনে আমার সামনে নিয়ে আসি। আরেক হাত ধাঁ করে মাথার ওপর তুলে সব বিষ মিশিয়ে বলি, 'ইচ্ছে করে একটা চড়ে। বুঝলি

'বিয়ের কনেকে কেউ মারে ?'

মিঠুয়া মিটিমিটি করে হাসে আর বলে।

'মারে। তোর মতো কনেকে মারতেই হয়। তোর বন্ধুটি কই

'কেন ? তাকে আবার কেন

'আহ, কই সে

'খুব দরকার চোখ মটকে বলে মিঠুয়া।

'আহ, মিঠুয়া। তোকে একটা কথা বলব। সে মেয়ে না শোনে, তাই শুধোচ্ছি, কোথায় ?'

'ঘরে।'

আমি তখন মিঠুয়াকে আমার ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে ঠেলা দিই। হি হি করে হেসে ওঠে মিঠুয়া।

'আরে তোমার ঘরেই তো আছে সুরাইয়া।'

'আমার ঘরে ? আমার ঘরে কি করছে ?'

মিঠুয়াকে ছেড়ে দিয়ে আমার ঘরে ছুটে যাই। আমার সংধন নীলমনি বেতের আরাম চেয়ারটায় বসে সুরাইয়া বেগম গানের ক্যাসেট পছন্দ করছেন। ইতিমধ্যেই তার কানে ক্যাসেট প্লেয়ারের হেড ফোন চড়ে আছে। অর্থাৎ কোনো একটা ক্যাসেট শোনা চলছে। সুরাইয়া

আমাকে দেখতে পায়নি, শুনতে তো নয়ই।

কিছু বলতে যাব, মিঠুয়া আমাকে ঠোঁটে আঙুল তুলে 'চুপ' ইশারা করে সরিয়ে আনে নিজের ঘরে। বলে, 'আমার ঘরে তো প্লাগ পয়েন্ট নেই। আমিই দিয়েছি তোমার ঘরে শুনতে। আহা, হলোই বা তোমার প্লেয়ার। খেয়ে তো ফেলছে না।'

কাকে কি বলব ? কোনটা নিয়ে রাগ করব ?

মিঠুয়া আমাকে ঠেলা দিয়ে সিলেটের বিখ্যাত সেই শীতল পাটির ওপর বসিয়ে দেয়। চারদিকে সেলাই করা জরির বর্ডার। সারা পাটিতে লাল রঙে আঁকা মোটা দাগের ফুল নকশা কাঁচা হলুদে কোথাও কোথাও মাখামাখি। হঠাৎ শংকিত হয়ে পড়ি। এই রে। গেছে আমার ট্রাউ-জার।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজে পাছা দেখার চেষ্টায় নিজেরই চার-দিকে নিজে বোকার মতো ঘোরা আর হাত ঝাড়া দিয়ে পেছন পরিষ্কার করতে থাকা - দেখে মিঠুয়া হেসে কুটিপাটি।

আমি গরম হয়ে ওর দিকে তাকাই। ও আমার পেটে এক খোঁচা দেয়।

'মিঠু, এটা মোটেই ভালো হচ্ছে না। তুমি জানো, ক্যাসেট প্লেয়া-রটা আমার জানের জান। আমি জানি, একটু আগেই মেয়েটি তোমার ঘরে ছিল। আমি দেখেছি। তোমার মার সঙ্গে কথা বলছি, এর মধ্যে সে গিয়ে যন্ত্রে হাত দিয়েছে।'

'কোথায় হাত দিয়েছে ?'

'যন্ত্রে, যন্ত্রে, আমার যন্ত্রে।'

'আহ, মামা তুমি যে কি বলো না বলো।' হেসে ভেঙ্গে পড়ে মিঠুয়া।

আমার চোখ খুলে যায়। আমি গুম হয়ে যাই। আমার চেয়ে তো মিঠুয়া পাঁচ বছরের বেশি ছোট হবে না। ওর বয়সে আমি এর সিকির সিকি বুঝতাম না। দিনকাল কি এত দ্রুতই পাল্টাচ্ছে, যে, পাঁচ বছরের ভেতরে দিন রাতের ফারাক হয়ে যাচ্ছে।

গম্ভীর হয়ে বলি, মিঠুয়ার দিকে তর্জনী তুলে দাগিয়ে দাগিয়ে বলি, 'আমি এখানেই ছিলাম, আমার পারমিশন নেয়া উচিত ছিল।'

মিঠুয়ার হাত ধরে ওর পাটির ওপর বসিয়ে দিই।

'তোর শাড়িতে হলুদ মাখামাখি হয়ে আছে, তোর আর ভয় নেই।'

'মামা; তুমি আমাকে হলুদ দাওনি ?' চোখ গোল করে মেয়েটা বলে, 'দিতে হয় কিন্তু।'

'যা, যা, তোর হলুদ। যা বলছিলাম। এসব কি শুনছি ?'

হাসি নিভিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ চেহারা করে মিঠুয়া বলে, 'কি শুনছ ?'

'মনসুর সায়েব লোক পাঠিয়েছিল।'

'কখন ?'

'সব জানিস। ন্যাকামী করিস না। ঘন্টাখানেক আগে।'

'পাঠিয়েছিল ? কেন ? আমি জানি না তো।'

হুঁ, হতেও পারে। মিঠুয়া জানে না। মিঠুয়া যে জানবেই তার কোনো গ্যারান্টি নেই। বরং না জানাই সম্ভব। মনসুর সায়েবের লোক মেজভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে নিচে থেকেই ফিরে গেছে। মনে হয়।

ধীরে ধীরে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে, স্পষ্ট করে আমি উচ্চারণ করি, 'মিঠুয়া। মনসুর সায়েব লোক পাঠিয়েছিল। সে লোক তোমার মেজ মামাকে টাকা দিয়ে গেছে। তোমার বিয়েতে খরচ হবে, সেই খরচের টাকা দিয়ে গেছে। সে কেন টাকা দিয়ে গেছে ?'

মিঠুয়া এক মুহূর্ত চুপ থেকে, ঢোঁক গিলে বলে, 'বললে তো, বিয়েতে খরচ হবে, সেই টাকা।'

'সেই টাকা ?'

'হ্যাঁ তো, সেই টাকা। আবার কিসের টাকা ?'

'তুমি চেয়েছিলে ?,

'হ্যাঁ, আমি চেয়েছিলাম।'

'কখন চেয়েছিলে ?'

'যখন বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছিল।'

'বিয়ের তারিখ তো তোমরাই ঠিক করেছিলে।'

'হ্যাঁ, আমরাই ঠিক করেছিলাম।'

'এ বাড়িতে বিয়ে হবে তাও ঠিক করেছিলে ?'

'হ্যাঁ। মনসুর বিয়েটা বিয়ের মতোই হোক চেয়েছিল তো।'

'তাই বাড়িতে ?'

'হ্যাঁ, আর কোথায় ? বাড়িতে বিয়ে না হলে আর দশটা বিয়ের মতো হয় ? আর হয়, লেডিজ ক্লাব, কি কমিউনিটি সেন্টার কি

কোথাও। তো মনসুর বলে, না বাবা, অত জাঁকজমক করে দরকার নেই।'

'বাহ, বাহ, বা' আমি বিস্ময়ের এক কৃত্রিম ঝরণা তৈরী করি। তারপর চেহারা কঠিন করে বলি, 'বিয়ে ঠিক করলে তোমরা, তারিখ ঠিক করলে তোমরা, কোথায় বিয়ে হবে, কতটা জাঁকজমক হবে, সব ঠিক করলে তোমরা, আমাদের শুধু অপমান করবার জন্যে ভিকিরি মতো হাত পেতে দাঁড়াতে বললে? তোমার মেজমামাকে তো জানো, টাকার ব্যাপারে তার মুখে 'না' নেই, সেই সুযোগটা নিয়ে মামা বাড়ির মুখে কালি মাখালে। অ্যাঁ? বলো কিনা? মামাদের সবকিছুর শোধ এইভাবে দিলে মিঠুয়া? বলো।'

মিঠুয়া কাঁদতে কাঁদতে বলে, অভিমানে মাথাটাথা দুলতে থাকে তার, কান্নার দমকে দমকে সে বলে, 'টাকা না দিলে টাকা তোমরা পেতে কোথায়? তোমাদের টাকা আছে? তুমি তো এখনো এমেই পাশ করোনি। মেজমামা মাইনে দিয়ে মাস চালাতে পারে না। বিয়ের টাকা তোমরা দিতে কোত্থেকে?'

ঘঁষে ঘঁষে চোখ মুছে নেয় মিঠুয়া। আমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয়। বিসদৃশ্য রকমে চুপ করে আমরা দু'জনের একজন বসে, একজন দাঁড়িয়ে থাকি, কেউ কারো দিকে তাকাতে পারি না। গুরুজন হিসেবে বরফটা ভাঙ্গার কথা আমারই।

আমি ডাক দিই, 'মিঠু।'

জবাবে মিঠুয়া ফোঁৎ করে নাকে সর্দি টেনে নেয় খানিক।

আমি বলি, 'বিয়েটা না করলেই চলছিল না?'

আবার সর্দি টানে মিঠুয়া। এভাবে সংলাপ চলে না। কি একটা শব্দে পেছন ফিরে দেখি, কখন সুরাইয়া এসে দাঁড়িয়ে আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে এবার গা ঠেলে এগিয়ে এসে কাছাকাছি একটা জায়গায় ঈষৎ ঢলে পড়ে দাঁড়ায়।

খানিকক্ষণ কৌতুক নিয়ে আমাকে দেখে সে বলে, 'ছেলেরা নিজের পয়সায় বিয়ে করতে পারে। দোষের কিচ্ছু নেই। তাদের বেলায় খুব প্রশংসার। মেয়েরা করলেই ছীছি? মিঠুর বরের টাকা মিঠুর টাকা একই কথা। মনে করুন না, মিঠু নিজের টাকায় নিজের বিয়েটা করছে।'

যে কথাটা লুকোবো ভেবেছিলাম, এ মেয়ে দেখি আগে থেকেই তা

জেনে বসে আছে। আমি তার কথার কোনো যুৎসই উত্তর খুঁজে পাই না। আঙুল নাচিয়ে অর্থহীন একটা ওপরতলার ভঙ্গিতে বলি, 'আচ্ছা, এর একটা হবেই হবে।'

এবং বলে আমি নিচে নেমে যাই।

৭

দেখি বড়বু ঘসঘস করে রুই মাছটা কেটে কুটে গামলায় ডাই করে রাখছে। পাশে মোড়ার ওপর গম্ভীর মুখে বসে মেজভাই। নীরব চোখে দেখছে।

আমি নামতেই মেজভাই তড়বড় করে উঠে দাঁড়ায়, আমাকে এক পাশে টেনে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'মোহরটা নিয়েছিস ?'

'মোহর আমার ঠিক মনে পড়ে না। মোহর শব্দটির ব্যবহার আমাদের জীবন থেকে একেবারেই উঠে গেছে। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই।

'আহা, মাছের মুখের ভেতরে যে জামাই বাড়ি থেকে মোহর দিয়েছিল।'

ও তাই বলো। আমি মাথা নাড়ি।

'ঐ ওর বন্ধুর কাছে আছে। নিসনি ?'

আমি ঠোঁট ওলটাই। মেজভাই ভালো করে আমার ওপর রাগ ফলাতেও পারে না। কারণ, মেয়ের বিয়ে বা গায়ে হলুদের কোনো কিছু নিয়ে আমরা আলাপ করছি, এবং বেশ স্বাভাবিক ভাবেই আলাপ করছি, যেমনটা যে কোনো ভদ্র বিয়ে বাড়িতে হয়ে থাকে, তাহলে বড়বু মনে কষ্ট পাবে। বড়বু তো এ বিয়ে আদৌ চায়নি। মাছ কাটতে হাত দিয়েছে, এতেই আমি অবাক হয়ে গেছি। এ মাছ আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলার কথা তার !

মেজভাই আমার পেটে খোঁচা দিয়ে বলে, নিয়ে নিবি। এক্ষুণি।

হারিয়ে ফেলবে।'

বড়বুর কাছে সরে এসে বলি, 'কি, খাবার দেবে মনে হলো।'

মেজভাই বলে 'মিষ্টি ফিষ্টি আছে, খেয়ে নে। এত রাতে ভাত কে করবে তোর জন্যে ?'

বড়বু চট করে হাত ধুয়ে বলে, 'আমি করে দিচ্ছি। ভাত না খেয়ে সানো থাকতে পারে ?'

আজ সারাদিনে আমি আরেক প্রস্থ অবাক হয়ে যাই, আজ সারা দিনই হচ্ছি, থেকে থেকেই অবাক হচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবার অবাক হই বড়বুকে দেখে। এই তো আজ সারাদিন নাওয়া না খাওয়া না ঘরে পড়ে ছিল, কি মন খারাপ, কি মন খারাপ। মানানসই হতো এক্ষুণি দুমদুম করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে, দড়াম করে নিজের ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়লে। তা নয়, এত রাতে যাচ্ছেন ভাত চড়াতে। শুধু ভাত তো খাওয়া যায় না। তরকারি চাই। হয়ত দু'খানা রুই মাছই ভেজে নামাবে। অবাক হয়ে যাই, বড়বু হঠাৎ কেমন তার স্বাভাবিকতার ভেতরে ফিরে এলো দেখে। অথচ এমনটি তো হবার কথা নয়। খুব ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলে বড়বুর ফিট হয়ে পড়ে থাকবার কথা, পাগল হয়ে বেরিয়ে যাবার কথা, গলায় দড়ি দেবার কথা। ষোলো বছরের মেয়ে চল্লিশ বছরের দোজবরে বিয়ে হচ্ছে। ভাবা যায় না। কোনো কায়দা নেই ভাববার।

আমাদের সবারই কি ভয়াবহ বদল হয়ে গেছে। আগে আমার চোখে পড়েনি। মিঠুয়ার এই বিয়ে। এই বিয়ের দরুণ চোখে পড়ছে। যুক্তি নেই। পারম্পর্য নেই। হৃদয় নেই। স্থায়িত্ব নেই। শক্তি নেই। সবচেয়ে মারাত্মক, আগে থেকে কিছুই আর নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে এইই হবে, এটাই সম্ভাবনা এ রকমই সম্ভব। যা কিছু হতে পারে। যে কোনো সময়ে হতে পারে। এখন যদি মিঠুয়া এসে বলে, এ বিয়ে হচ্ছে না, আমি একটুও অবাক হবো না। এখন যদি আমার মেজবু এসে বলে, শ্বশুর বাড়ি আর আর ফিরে যাচ্ছি না— চমৎকার বলে মেনে নেবো। বেশি কথা কি ? বড়বুই যদি একটা কান্ড করে বসে, চোখ কপালে তুলব কি ? তুলব না।

মেজভাই হঠাৎ চুকচুক করে আপশোষ করে ওঠে।

'এহেহেহে, খবরটা শোনা হলো না।'

'কি আর আছে খবরে। ঐ তো এক প্যাচাল।'

'শুনিসনি তো। শুনেছিস ?'

'কি ?'

'জনদল শেষ।'

'তার মানে ?'

'নতুন আরেকটা পার্টি হচ্ছে। আজকালের মধ্যেই অ্যানাউনস হবার কথা।

'বলো কি, এই সেদিন জনদল করা হলো। প্রেসিডেন্ট এই যোগ দেয় কি সেই যোগ দেয় জনদলে। ছোট বড় নেতা সব নিজের নিজের পার্টি তুলে দিয়ে জনদলে ভিড়ে গেল। এখন শেষ ?'

'হুঁ হুঁ বাবা, এর নাম পলিটিকস। বাংলাদেশের পলিটিকস। কে যে কোথায় কখন কি করবে কোন দিকে মোড় নেবে, কিছু ঠিক নেই। বিবিসিটা শোনা উচিত ছিল। তা তোদের ড্যামাডোলে।'

বড়বু এসে বলে, কোমল গলায়, মা'র কথা মনে নেই, মনে হয় মায়ের মতো গলায়, 'সানো, মাছ খাবি ?'

বলেছিলাম না ? মাছ না রেঁধে বড়বু ছাড়বে না।

'মাছ থাক, তুমি ভাতে ভাত করো তো।'

'তুই তো মাছ ভালোবাসিস। মনো ভালোবাসে। দিই না করে দু'খানা।' তারপর ইতস্তত করে বড়বু ভাঙা গলায় বলে, 'মিঠুর কে বন্ধু এসেছে, সে খেয়েছে ?'

আসলে নিজের মেয়ে খেয়েছে কিনা, সেই কথাটা।

আমি দু'হাত তুলে বলি, 'না, কেউ খায়নি। কে খাবে ? তুমি নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ, কার গলা দিয়ে ভাত নামবে ?'

বোধহয় ঝুঁকিটা একটু বেশিই নিয়ে ফেলেছি। বড়বু হঠাৎ বেঁকে বসতে পারত। ফোঁস করে উঠতে পারত। ভেঙে চুরে রেখে নিজের ঘরে চলে যেতে পারত। কিছুই করল না। নিঃশব্দে নাটকখানা পার হয়ে গেল। বোধহয় মিঠুয়ার বিয়েটা এই মুহূর্ত থেকে বড়বু মেনেই নিল।

এই বিয়ের ব্যাপারে আমিই প্রথম মিঠুয়াকে সাপোর্ট করি। আমি দেখি ওরা সব ঠিক করে ফেলেইছে, আমরা বেঁকে দাঁড়ালে ওদের কিছু হবে না, আমরাই কষ্ট পাবো। এই বিয়ের জন্যে যত কষ্ট, তা তো আছেই, তার ওপরে আমাদের এখতিয়ারের বাইরে বিয়ে হলে দুনো কষ্ট। অতএব কথাটা বাড়িতে আমিই প্রথম ভাঙি। আমিই প্রথম

ঘোষণা করি, যে, মিঠুয়া যা করছে খুব একটা খারাপ কিছু করছে না। অনেক সময় জোর দিয়ে একটা কথা বললে সেটাই টিকে যায়। এ বিয়েতে প্রত্যেকের মতামত যাই থাক, অন্তত একটা বিষয়ে সবাই একমত যে. এর চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি হতে পারত। এ যা হচ্ছে এমন কিছু কেলেঙ্কারির কিছু হচ্ছে না।

রান্নার কিছু দেরী আছে দেখে আমি আবার ওপরে উঠে যাই। সুরাইয়ার কোলে মাথা দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে মিঠুয়া। বুকের ভেতরে ছাঁৎ করে ওঠে। জানি, কিছু না। তবু। আমার পায়ের শব্দে মিঠুয়া একবার চোখ খুলে আবার বুজিয়ে ফ্যালে।

'মিঠু, সুখবর আছে।'

মিঠুয়া বান্ধবীর কোলে মাথা রেখে বড় সুখে পড়ে থাকে। নড়ে না। কথা বলে না। আমি জানি, সে আমার পরের কথার জন্যে অপেক্ষা করছে।

'মিঠু, তোমার মাছ। মা কুটছে।'

'যাহ।'

ধড়ফড় করে উঠে বসে মিঠুয়া। সুরাইয়া বলে, 'দেখে আসব ?'

'বিশ্বাস না হলে দেখে এসো। শুধু কাটছে না। রাঁধছে। আমরা খাবো। সবাই এখন মাছ দিয়ে খাবো।'

হঠাৎ কি হয়, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মিঠুয়া।

'আরে, কি হলো ? এই মিঠু।'

আমার কোলের মধ্যে মেয়েটা ভেঙে পড়ে। আমি অসহায় চোখে সুরাইয়ার দিকে তাকাই। সুরাইয়া সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। মিঠুয়াকে ধরে না। তখন আমি মিঠুয়াকে আরো ভালো করে কোলে টেনে নিই। ওর হলুদ টলুদ আমার জামায় লেগে যায়। মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। চুলের ভেতরে আঙুল নিয়ে খেলা করি।

আর মুখে বলি, 'তুই কাঁদলে আমারও কিন্তু। বুঝলি। আর একটা দিন পরে আমাদের সব ছেড়েছুড়ে তো ? জানি। চুপ কর। আহ. চুপ কর। সারাদিন না কেঁদে, এখন। এই তো

আমার কথাগুলোর কোনো মানে টানে হয় না, কথাগুলো আমি শেষও করতে পারি না, বড় বেসামাল হয়ে পড়ি। খপ করে সুরাইয়া আমার হাত ধরে সরিয়ে দিয়ে বলে, 'হয়েছে, এবার যান তো। গিয়ে কবিতা লিখুন। খুব দুঃখের একটা কবিতা লিখুন গে। যান।'

উঠে দাঁড়াই। মোহরের কথাটা মনে পড়ে।

মিঠুয়াকে খুশি করবার জন্যে খুব উৎফুল্ল গলায় বলি, 'তুই কিন্তু জবর দেখালি।'

সে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকে।

'গায়ে হলুদ তো গায়ে হলুদ, ঐতিহ্যবাহী গায়ে হলুদ।'

'তার মানে?' ভ্রূ কুঁচকে সুরাইয়া আমার দিকে তাকায়। বাহ, এই ভঙ্গীটাতে বেশ লাগে তো। আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকি।

মিঠুয়া আমাকে শাসন করে বলে, 'মামা।'

আমার চমক ভাঙে। একটু অপ্রস্তুত যে হইনি তা নয়। ঘোর কাটিয়ে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, 'মিঠু, তুই যে বলেছিলি, বিয়েতে যা যা নিয়ম সব তুই মনসুর সায়েবকে করতে বলেছিস, সে করবে, সে তো এক কান্ড করে বসেছে। নানী দাদীর আমলে যেমন হতো, গায়ে হলুদের মাছ, সেই মাছের মুখের ভেতরে মোহর ঢুকিয়ে পাঠানো হতো, যে কুটবে মোহর তার পাওনা, তোর মনসুর সায়েব তো তার রুই মাছের মুখে মোহর পুরে পাঠিয়েছে। জানিস?'

আমাকে চমকে দিয়ে সুরাইয়া বলে, 'না, তাই? কই?'

তার মানে? এ কথা বলছে সুরাইয়া? মেজভাই বলল মোহর আছে সুরাইয়ার কাছে।

তবে?

আমি সুরাইয়ার দিকে চোখ সরু করে তাকাই সুরাইয়া আবার আমার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। কিন্তু এবার আর মুগ্ধ হবার মতো মনের অবস্থা নয় আমার।

আমি নিজেই শুনি আমি বলছি, 'কই মানে?'

সুরাইয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, 'কই মানে? মোহরটা কই?'

আমি মিঠুয়ার দিকে তাকাই।

মিঠুয়া বলে, 'দেবে তো, যা যা নিয়ম সব দেবে। মামা, তোমরা বলতে পারবে না যে পাগলামো করে বিয়ে করছি বলে সবই পাগলামো।' মিঠুয়া উঠে বসে। হাই তুলে, 'আমি ভাবছি, আজকালকার দিনে ও মোহর পেল কোথায়? নিশ্চয়ই খুব খুঁজতে হয়েছে।'

আমি চট করে একটা সিদ্ধান্ত নিই। বলি, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই। এ কি আর সব দোকানে পাবার জিনিস আমি সিদ্ধান্ত নিই, যে, মোহর বিষয়ে উদ্বেগজনক কিছু এখন এ ঘরে বলা হবে না। মনে মনে

কিন্তু আমার তোলাপাড়া চলতেই থাকে। মোহরটা গেল কোথায় ?

মেজভাই যেভাবে বলল, তাতে মনে হয়েছিল সে নিজের চোখে মোহরটা মাছের মুখ থেকে বেরুতে দেখেছে। এবং সে নিজের চোখেই দেখেছে সুরাইয়াকে মোহরটা নিতে।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে, পুরো ব্যাপারটাই অনুমানের ওপর বলেছে মেজভাই। ক'দিন থেকেই মিঠুয়া বাড়িতে রটাচ্ছিল, যে, মাছের মুখে মোহর আসছে; সেটা শুনেই কি মেজভাই ধরে নিয়েছে এই যে মাছ এর মুখের ভেতরে মোহর আছে ? এমন হতে পারে নাকি, মনসুর সায়েব খুঁজে পাননি কোথাও, অতএব পাঠাননি।

কিংবা, আমি সুরাইয়াকেই বা কেন বাইরে রাখব ? সে যদি মোহরটা গায়েব করে থাকে ?

'অত কি দেখছেন আমার দিকে অ্যাঁ ?'

হ্যাঁ, তাইতো, এও তো হতে পারে, মোহর দিয়েছিল মনসুর সায়েব কিন্তু সুরাইয়া সেটি সরিয়েছে।

সুরাইয়া বলে, 'কই, দেখান না মোহরটা।'

আরে, এ তো ভারী ঝামেলা হয়ে গেল দেখছি।

'বাদশাহী আমলের মোহর ?'

নাহ্, আর পারা যাচ্ছে না। 'মোহর' শব্দটা শুনতেই এখন খারাপ লাগছে। দুর-দুর করতে ইচ্ছে করছে। কি করি ? কিভাবে সত্যিটা আবিষ্কার করি ? একটা আস্ত মোহর, সোজা কথা নয়।

'দেখাবেন না ?'

'দেখাব।'

'কখন ?'

কৃত্রিম ভয় গলায় এনে বলি, 'বড়বুর যা মেজাজ, আগে ঠান্ডা হোক, তারপর।'

'তবে-এই যে বললেন, সুখবর আছে, মিঠু, তোর মা মাছ কুটছে। মাছ কুটছে তো মেজাজ খারাপ আবার কি ? অ্যাঁ ?'

আরে বাপ, এই সুরাইয়া মেয়েটি তো দেখছি অ্যাডভোকেট হবার লায়েক।

'বাবা, বলেছি তো দেখাব।'

নিচে থেকে মেজভাই হাঁক পাড়েন।

'এই সানো, ওপরে কি ? ওপরে এত কি ?'

নামতে নামতে শুনতে পাই বড়বু বলছে, 'তোর যেমন কথা, মনোয়ার। ভাগনির বন্ধু ভাগনি।'

'রাখো তো বু। এইসব আজকালকার মেয়ে, লাইফ নষ্ট করে ছাড়বে।'

'যেমন তোর নষ্ট করে ছেড়েছে। এবার একটা বিয়ে কর, মনোয়ার।'

'কিসের মধ্যে কি? তোমার যত সব। আমাকে শান্তিতে দেখে তোমাদের ভালো লাগে না। আমার পেছনে পাগলা কুত্তা লেলিয়ে না দিতে পারলে তোমাদের সুখ হচ্ছে না?'

এই রে। মেজভাইয়ের মেজাজ আবার খারাপ হতে শুরু করেছে। আবার কখন প্রসন্নতা ফিরে আসবে, কে বলবে?

আমি আর নিচে নামি না। রান্নার এখনো কিছু বাকি। নেমে লাভ নেই। ওপরেও নয়, নিচেও নয়, তারচেয়ে ছাদে যাওয়া যাক। আমার মাথাটাও একটু পরিষ্কার করে নেয়া দরকার। থেকে থেকেই মেজবুর ভাবনাটা এসে চড় মারছে। বাড়ি ফেরেনি, গেছে কোথায়?

সত্যি কথা বলতে কি, আমি মেজবুর চরিত্র-ফরিত্র নিয়ে মোটেই ভাবিত নই। কোনো বিপদে না পড়ে, প্রাণ না সংশয় হয়, এই দেশের কোথাও কোনো চরিত্র নেই, মেয়েদের চরিত্র রক্ষা হলেই সর্বকুল রক্ষা? বাহ্।

ছাদে বড় একা লাগে। এই জায়গাটা একেবারে আলাদা। বাড়ির সঙ্গে একটুও মেলে না। কারো বাড়ির সঙ্গেই তার ছাদের কথাটি মেলে না। এ একেবারে অন্যরকম কবিতা। ইব্রাহিমের কথা মনে পড়ে। বেশ কিছুদিন পরে আজ দেখা। চুল আরো রুক্ষ হয়ে গেছে ইব্রাহিমের দাড়ি গোঁফ আরো উদ্‌ভ্রান্ত। কিন্তু শার্ট ট্রাউজার বেশ ফটফটে পরিস্কার, একেবারে চলতি ফ্যাশানের ছাঁটকাট সবচেয়ে নতুন যেটা চোখে পড়ল, আত্মবিশ্বাস। ইব্রাহিমকে দেখেই মনে হয়েছিল আমার, পায়ের নিচে মাটি আছে তার। কিন্তু ও কথা কেন বলল ইব্রাহিম? 'কবিতা লিখে কি হবে?'

আমাকে খুশি করবার জন্যে বলেছে কি?

আমাকে? খুশি করবার জন্যে?

তবে কি করুণা করছে আমাকে ইব্রাহিম, এই যা আমার ওপর দিয়ে গেছে তার জন্যে?

আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি নিচে থেকে মিঠুয়াকে, সুরাইয়াকে ডেকে আনবার জন্যে ছটফট করে উঠি। বোধহয় আমার প্রয়োজন থেকেই তৈরী হয়ে যায় ওদের দুটি উপস্থিতি। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে দুই বান্ধবী।

'আয়, মিঠু, আয়।'

৮

ছাদে একটা চৌকি পড়ে থাকে। সেই কবে থেকে বর্ষায় ভিজে রোদে পুড়ে অনেকের চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ। আমার অনেক লেখা অনেক পড়া এই চৌকিতে।

মিঠুয়াকে ডেকে নিয়ে আমি চৌকির ওপর বসি। সুরাইয়াকে ডাকতে হয় না, সে লাফ দিয়ে একটা কোণ দখল করে মিঠুয়ার হাত টেনে বলে, 'আয় না ?' আমার দু'দিকে ওরা দু'জন জায়গা নিয়ে নেয়।

'সুরাইয়া বলে, 'জানেন ? আমরা আপনাকে খুঁজছি ?'

'খোঁজার কি আছে ? আমি তো আছিই।'

'সে রকম খোঁজা নয়।'

সুরাইয়ার কথা শুনে আমি গম্ভীর হয়ে যাই। মেজভাই একটু আগে নিতান্ত মন্দ বলেনি। এইসব মেয়েরা লাইফ হেল করে ছাড়বে।

আমাকে অবাক করে মিঠুয়া সুরাইয়াকে মৃদু শাসন করে, 'তোর সব তাতেই ইয়ে।'

'বারে।' সুরাইয়া দু'দিকে দু'হাত তুলে নির্দোষ মানুষের পোঁজ দেয়।

মিঠুয়া আমার হাত মুঠোর ভেতরে টেনে নিয়ে বলে, 'মামা, তোমাকে আমি একটুও পাচ্ছি না।'

'পাচ্ছিস না মানে ? এই তো, দিব্যি হাতখানা দখল করে নিয়েছিস।'

'তুমি আমার কাছে বসছ না। একটুও না।'

আমি ইতস্তত করি। মিঠুয়া মায়ের মতো শাসন করে ওঠে, 'উঁহু, মিথ্যে কথা বলবে না। তোমাকে স্বীকার করতেই হবে তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ।'

'তোর কাছ থেকে?'

সুরাইয়া এতক্ষণ চোখ দিয়ে একবার আমাকে একবার মিঠুয়াকে দেখছিল যখন যে কথা বলছিল। কথার কোন ফাঁকে সে কথা বলবে বুঝতে না পেরে বড় অস্থির হয়ে পড়ছিল। এবার ফাল চালিয়ে দিল।

'ওর কাছ থেকেই তো। ব্যাপার কি? অ্যাঁ? সাবজেক্ট কি মিঠু আপনার ভাগনি নয়?'

'ভাগনি তো। অফকোর্স ভাগনি।'

'মিঠু চুরি করছে না, ডাকাতি করছে না, যা করছে সবাই জানছে দেখছে। না?'

'হ্যাঁ। তা বটে। ঠিক।'

'তবে? পারত না? মিঠু পারত না কলগার্ল হয়ে যেতে

'মানে?' আমি সত্যি সত্যি বিরক্ত হয়ে পড়ি। ধমকে দিই। 'এসব শব্দ আমার সামনে ইউজ করবে না।'

'শব্দ তো শব্দ, রিয়াল জিনিসটা যখন আপনারা ইউজ করেন, তখন?'

আমি চমকে উঠি। আজ সন্ধ্যেয় রমনা উদ্যানে সেই বালিকার কথা মনে পড়ে যায়। বালিকার বুকে খসখসে এক মুঠো লাইলন আমার করতল শিউরে দিয়ে যায় এখন।

'সুরাইয়া, বাড়াবাড়ি কোরো না।'

আরো একবার আমার পক্ষে এসে যায় মিঠুয়া। সে সুরাইয়াকে বলে, 'আহ, তোর যে কি? এসব তোকে কে এখন বলতে বলেছে

'বলব না কেন? কেন বলব না

'না, প্লিজ। মামা পছন্দ করে না, সু।'

সুরাইয়াকে একটু বিচলিত মনে হয়।

আমি কোমল হতে চেষ্টা করি। বলি, 'আচ্ছা আচ্ছা আমি কিছু মনে করিনি। আসলে কথাটা তো ঠিকই। মিঠুর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের উচিত ওর কাছে কাছে থাকা। কিন্তু কে থাকবে? বড়রা তো জানোই। বোধহয় এতক্ষণে এইমাত্র মত কিছুটা পালটেছে। ও

আমি সিওর নই। মেজ মামা তোর? টোটালি আনপ্রেডিকটেবল। কিছু বলা যায় না। আর আমি আমি যে বাড়িতে একেবারে নেই, তা তো না, মিঠু।'

তিনজনের কেউ কোনো কথা বলি না অনেকক্ষণ। শেষে আমিই।

'আচ্ছা বল। মিঠু, এই তো আমাকে কাছে পেয়েছিস। বল, কি বলবি।'

'তুমি একটা বোকা, বুঝেছ মামা, তুমি বোকা। আমি কি কিছু বলার জন্যে তোমাকে খুঁজছি?'

'তবে?'

'থাক, তুমি আর কথা বোলো না।'

মিঠুয়া একটু রাগই করে হয়ত। হঠাৎ ফিক করে হেসে দেয় সুরাইয়া।

'কি হলো?' আমি জানতে চাই।

'না, এমনি। আমার এমনিতেই অনেক সময় হাসি পায়। কিছু মনে করবেন না, প্লিজ।'

পরিবেশটা কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমরা কেউ কোনো দিকে এগোতে পারছি না। হঠাৎ নাকে এসে মাছ ভাজার ঘ্রাণ লাগে। বড়বু রান্না করছে। আমি যে রুই মাছ ভেজে কালিয়া করে, পছন্দ করি, দেখেছ?—সেই কালিয়া এত রাতে করতে বসেছে বড়বু। পাগল আর কাকে বলে? আমি কিন্তু 'পাগল' শব্দটা মায়া-মমতা দেখিয়ে ব্যবহার করছি না। যাকে বলে রীতিমত 'মিন' করছি।

এ সব, আমার চারদিকে, সব, সব, পাগলামো বলে মনে হচ্ছে। নাকি সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক, কেবল আমিই ঠিক তা নই?

মিঠুয়া কলগার্ল হয়ে গেলেও আমি আর কি করতে পারতাম? আমার একার কি সাধ্য আছে? আমি কি উষ্ণক? যে, আলের ওপর শুয়ে পড়ে বন্যার তোড় ঠেকিয়ে দিলাম?

সুরাইয়া খুব মন্দ বলেনি। মিঠুয়া নষ্ট হয়ে যেতে পারত। মনসুরের সঙ্গে যখন তার আলাপ তখন লোকটি বিবাহিত, যদিও নাকি স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা ছিল না বলে দু'জনে আলাদা থাকছিল। মেলা বড়লোক, বিরাট ব্যবসা; মনসুর সায়েব দুনিয়ার অনেক দেখেছে। তার তুলনায় মিঠুয়া তো শিশু। ইচ্ছে করলে লোকটা ধীরে ধীরে নষ্ট করে ফেলতে পারত মিঠুয়াকে। রক্ষিতা করে রাখতে পারত। ভালো

করে কিছু বোঝার আগেই মিঠুয়া একদিন আবিষ্কার করত, ভদ্র এক বেশ্যা বৈ সে আর কিছু নয়। তবু তো বিয়ে। মন্দের ভালো।

'কি ভাবছেন ?'

সুরাইয়ার গলা আমাকে ঈষৎ নড়িয়ে দেয়।

'না, কিছু না। এমন কিছু না।'

'কবিতা ?'

আমি ম্লান হাসি।

সুরাইয়া আবার বল্লে, 'ঠিক, কবিতা।'

'না, সুরাইয়া। কবিতা অনেকদিন লিখি না।' বলতে চেয়েছিলাম —কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু কথাটা গলার কাছে আটকেই রইল, বলতে পারলাম না।

'কেন লেখেন না আপনার মতো ক্ষমতা থাকলে আমি রোজ একটা করে লিখতাম।'

'ঐ রকম মনে হয়, সুরাইয়া।'

'আসলে যার থাকে সে বড় হেলাফেলা করে।'

একটা ছোট নিঃশ্বাস পড়ে। এমন মনে হয়, এই নিঃশ্বাসটিও ঠিক আমার নয়। আবিস্কার করি, মিঠুয়া আমার হাত মুঠোর ভেতরে ধরেই রেখে দিয়েছে। এতে ওর কোন চিকিৎসা হচ্ছে কে জানে। ছ'-বছরের ছোট বড় আমরা। ভাই-বোনের মতো মানুষ হয়েছি বলা যায়। মিঠু এক সময় আমাকে 'ভাইয়া' বলত কিছু দিন। এই মিঠুয়া যখন বারো-টারো তখন থেকেই দূরত্ব রচিত হতে থাকে।

আমি এখন মিঠুয়ার আরেকটা হাত টেনে নেই। কাল বাদে পরশু পর হয়ে যাবে মিঠুয়া। বাড়িটা খালি হয়ে যাবে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের মতো। পুরনো নোনা ধরা বাড়ি। তিনটি চরিত্র। কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই। তিনজনই একা, আলাদা, চুপচাপ, নিজের ভেতরে, জলের শব্দ, ভাঙাচোরা অন্ধকার, কুয়াশা, কালভার্ট, ট্রেন চলে যায়।

'এখনো কিন্তু ভাবছেন।'

বলতে ইচ্ছে করে, আহ, চুপ করো সুরাইয়া কিন্তু বলা যায় না। হাতের ভেতরে হাত মিঠুয়ার সঙ্গে নীরবে আমার কথা চলছে। এর মধ্যে এই মেয়েটার গলা। উত্তরে আমি একটু হাসি মাত্র। দূরের দিকে তাকিয়ে থাকি। এক ফোঁটা বাতাস নেই। গাছের একটা পাতা নড়ে না। বাড়িগুলোর জানালা সব খোলা। লালচে সব আলোর খোপ

সারা শহরে।

সুরাইয়া আমার সাড়া না পেয়ে অন্য পথ ধরে।

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব

'করো।'

'যদি ব্যক্তিগত না হয়।'

'করোই না

'আপনি সব সময় ডার্ক গ্লাস পরেন কেন

আমার হাত উঠে আসে নাকের ডগায়, কালো চশমার ওপরে। টিপে টিপে আমি পরখ করতে থাকি। ফ্রেম, কাঁচ, মাঝখানের জোড়া। আজ দু'বছর হয়ে গেল।

'এখন তো রাত, এখনো পরতে হয়

এই নিয়ে মিঠুয়া তৃতীয়বার শাসন করে ওঠে সুরাইয়াকে 'কিরে তুই মামাকে নিয়ে পড়েছিস।'

'না মানে, অনেক দিন থেকে জিজ্ঞেস করব করব ভাবছি। আজ চানস পেয়ে গেলাম।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলে, 'স্টাইলটা কিন্তু পুরনো।'

'পুরনো মানে ?'

'জিয়াউর রহমান করে গেছে।'

'সুরাইয়া, মামা স্টাইলের জন্যে ডার্ক গ্লাস পরে না।'

মিঠুয়াকে আমি বাধা দিই। তরল করে দেবার জন্যে জোর করে হেসে উঠি।

'আরে, তুই দেখি, সত্যি সত্যি একে বারে। এত সিরিয়াসলি নিচ্ছিস কেন ?'

মিঠুয়া আমার ভাবসাব বুঝতে না পেরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। এখন তার আমার জন্য অত সময় দেবার মতো মন নেই। পরশু বিয়ে। মিঠুয়া বোধহয় তার বিয়ের ভয়, বিয়ের স্বপ্ন, বিয়ের দোলা, বিয়ের কম্পনের ভেতরে ফিরে যায়।

সুরাইয়াকে আমি বলি, যথা সম্ভব তরল কন্ঠে বলতে চেষ্টা করি, 'জানি, জিয়াউর রহমান সান গ্লাসের ব্যবসা ডকে তুলে দিয়ে গেছে। পরলেই মনে হয়, বি-এন-পি। ঠিক বলেছ।'

'তবে পরেন কেন ? তাও যদি জিয়ার আমলে পরতেন, বুঝতাম। এখন পরে লাভ ? এখন বরং বিপদ।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ জানেন না ? কোন দেশে বাস করেন

আমার ভালোই লাগে এখন। সুরাইয়ার সঙ্গে খুনসুটি করতে ইচ্ছে করে।

'তোমার আব্বার খবর কি বলো।'

'চলছে।'

'কি চলছে।'

'চেষ্টা।'

বুঝতে পারি, সুরাইয়া নিছক মজা করবার জন্যে একটি একটি শব্দে এখন কথা বলছে।

জিজ্ঞেস করি, 'কিসের চেষ্টা ?'

'মন্ত্রী।'

আমিও পালটা মজা করবার জন্যে এবার একটি একটি শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করতে থাকি।

বলি, 'হবেন ?'

'মনে হয়।'

'শীগগির ?'

'হয়ত।'

'মিষ্টি ?'

'খাওয়াবো।' বলেই হেসে ফ্যালে সুরাইয়া। বলে, 'আব্বা যদি এবার ক্যাবিনেট রিশাফলেও চানস না পান, নির্ঘাত হার্ট'ফেল করবেন।'

'কি ঠাট্টা করছিস, সু।' মিঠুয়া বকে দেয়।

'ঠাট্টা মানে ? আমার আব্বা আমি জানি না ? বঙ্গবন্ধুর আমলে মন্ত্রী ছিলেন, জিয়াউর রহমানের ক্যাবিনেটে অনেক দিন মন্ত্রী ছিলেন, তারপর এত দিন বসে, ডাক আসে না, ডাক আসে না, ভাল লাগে ? বলুন, আমার আব্বার ভাল লাগতে পারে

খুব সাফ সাফ কথা সুরাইয়ার। আজকাল এটাই দস্তুর। আমার মেজভাইকে দেখেছি, একটু আগের মানুষ তো, সোজাসুজি কিছু বলতে পারে না। আমি পারি।

তবু এত সাফ কথা আমাকেও একটু নড়িয়ে দেয়।

সুরাইয়া নড়েচড়ে বসে আঙুল নাড়িয়ে বলে, 'আমার মনে হয় কি জানেন ? আব্বা কেন ডাক পাচ্ছেন না ? বলব ? আপনার মনে আছে,

জিয়াউর রহমানের লাশ যেদিন চিটাগাং থেকে এলো আব্বা তো তখন মন্ত্রী। মনে আছে ?'

'হ্যাঁ, আমার মনে আছে।'

'আব্বা এয়ারপোর্টে। মনে আছে টিভি নিউজে ?'

'হ্যাঁ মনে আছে। টিভি নিউজে দেখেছি।'

'আব্বা, মনে আছে ?—লাশ নামার সঙ্গে সঙ্গে হাউ হাউ করে

মিঠুয়া সোজা হয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'হ্যাঁ, কান্না, সত্যি ভাই, তোর আব্বা এত কেঁদেছিলেন, এত কেঁদেছিলেন।'

সুরাইয়া তাকে হাতের ইশারায় চুপ করতে বলে আমার উরুতে হঠাৎ একটু হাত ছুঁইয়ে বলে 'আমার মনে হয় ঐ কান্নাই আব্বার বারোটা বাজিয়েছে। এত কান্না জিয়াউর রহমানের জন্যে ? তাঁকে আর মন্ত্রী করে ?'

'করবে।' আমি গম্ভীর গলায় ভবিষ্যৎ বাণী করি।

'আব্বা কিন্তু টিভি নিউজে ঐ কান্নার জন্যে এখনো বড় আপসেট হয়ে যান।'

'তোমার আব্বাও ঠিক জানে।'

'কি জানে ?'

'যে, লোক পাবে কোথায় ? আসলে, লোক তো সেই একই, যখন যে আসছে তার দলে গিয়ে ভিড়ছে। ভালো কথা, সুরাইয়া, জানো নাকি ? জনদল নাকি খতম।'

'হুঁ, জানি তো পুরনো খবর।'

বলে কি ? এই পুঁচকে ছুঁড়ির কাছে এটা পুরনো খবর আর বড় বড় কাগজগুলো এখন পর্যন্ত জানেন না

'কি বলছ, পুরনো খবর

'হ্যাঁ, সায়েব, হ্যাঁ। নতুন পার্টি হচ্ছে। আমার আব্বা আছেন ওর মধ্যে। আব্বার কাছে দিনরাত লোক। আব্বার টেলিফোন ননস্টপ ক্রিং ক্রিং। আমি জানি না ? আমার কাছে এসব পুরনো খবর।'

'আমি বলি, 'তাহলে মিষ্টি খুব শীগগির খাওয়াচ্ছ ?'

মিঠুয়া হঠাৎ বলে, 'তোরা তো তাহলে মিন্টো রোডের দিকে চলে যাবি ? না ?'

'হ্যাঁ, ওখানেই তো বাংলো দেবে।'

সুরাইয়া মেয়েটি কতবার যে মিন্টো রোড আর ওয়ারী করেছে তার

বাবার মন্ত্রী হবার কল্যাণে—এখন সেটা তার সংলাপে অভিজ্ঞতা হয়ে ফুটে বেরোয়।

'আমি অবশ্য খুব বেশি জিনিস নিয়ে মুভ করব না। কি জানি বাবা, কখন আবার ?' চোখে টুসকি তুলে সুরাইয়া নীরব হয়ে যায়।

মিঠুয়ার জন্যে আমার মায়া করে ওঠে মনটা। কেন ? তলিয়ে দেখে কিছুই পাই না এমনিতেই হয়ত। কোনো কোনো ডাক্তার বলে, মানুষের অনুভূতিগুলো নাকি স্নায়ুর হেরফেরের ওপর বদলায়, নতুন রূপ নেয়; বাইরের কিছুর সঙ্গে যোগ নেই।

সুরাইয়ার হাত ধরে মিঠুয়া আচমকা বলে, 'খুব ভালো হবে।'

আমরা কেউই প্রসঙ্গটা বুঝতে পারি না।

খুশি গলায় মিঠুয়া বলে, 'ওর বাড়ি, জানিস তো, এসকাটনে

'তোর বরের ?'

'হ্যাঁ, নিউ এসকাটনে।'

'তবে যে বলেছিলি, বনানীতে ?'

'সেটা ভাড়া বাড়ি ছিল। ওর সেই ডাইনি, তার গুলশান বনানী না হলে চলত না, তাই ভাড়া নিয়েছিল। আর নিজের বাড়িটা ভাড়া দিয়েছিল। এখন আবার নিজের বাড়ি। আমার বাবা এসকাটনই ভালো।'

কিছুটা জটিল মনে হয় সবকিছু। অবশ্য সরলার্থ বুঝতে পারি। মনসুর সায়েবের প্রথমা স্ত্রীর জন্যেই তাকে বনানীতে বাড়ি ভাড়া নিতে হয়েছিল। এখন তিনি নিজের বাড়িতেই নতুন বৌ নিয়ে থাকবেন। তবু কোথায় যেন আমি অনুভব করি, মিঠুয়া প্রতিযোগিতা অনুভব করছে তুলনা করছে। আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। ষোলো সতেরো বছরের মেয়ের পক্ষে একটু ওজনে ভারী হয়ে যায় ব্যাপারটা।

মিঠুয়া কিন্তু নির্মল খুশি নিয়ে বলে, 'তোরা মিন্টো রোডে গেলে কি যে ভালো হবে। রোজ দেখা হবে। দেখিস, তোর আব্বা মন্ত্রী হবেই হবে। আমার মন বলছে।'

আমার মন আর কিছু বলে না আমার মন মিঠুয়ার ঐ খুশি দেখে আরো ম্লান হয়ে যায়। আমি এক হাতে মুখ ঢাকি। কখন চশমা খুলে ফেলেছি টের পাইনি। হঠাৎ অনুভব করে উঠি। সঙ্গে সঙ্গে চশমাটা পরে নিই।

সুরাইয়া খিল খিল করে হেসে ওঠে। আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বলে, 'আপনাকে অবিকল জিয়াউর রহমানের মতো লাগছে।'

৯

খাওয়া টাওয়া শেষ করে বড়বু আমাদের নড়বড়ে খাবার টেবিলের ওপর সব সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে নিঃশব্দে ওপরে নিজের ঘরে চলে যায়। আমি ওপর থেকে দু'মেয়েকে ডেকে আনি। মিঠুয়ার খিদে নেই, ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে তার। সুরাইয়া এক গাদা মিষ্টি খেয়েছে। তবু আসে। থালা টেনে নেয়। মেজভাই ভাতে হাত দিয়েই আমার দিকে নীরবে একবার সংক্ষিপ্ত তাকায়। আমি মাথা নাড়ি। খুব আবছা করে। তখন মেজভাই যেন জোর পেয়ে দ্রুত হাতে ভাত মাখাতে থাকে। না, বড়বুকে ডেকে লাভ নেই। বড়বু এখন একা থাক। আসবে না। খাবে না। একবেলা না খেলে কিছু এসে যায় না, মানুষ মরে যায় না। মানুষ এত সহজে কষ্ট পায় না। মানুষের কষ্টগুলো অন্যখানে। মেজভাই ভালো করেই এসব জানে বলে তার আরো একখানা মাছ নিতে অসুবিধে হয় না। সুরাইয়া আমাদের দেয়া-থোয়া করে। রাত এখন বারোটার মতো।

ভাতের একটি দলা হঠাৎ আমার গলায় খপ করে আটকে যায়। মেজবুটা কোথায়? খেয়েছে তো? আহ, আমার কি? আমার কোন ঠ্যাকা আমার বৌ? কঁৎ করে ভাতের দলাটা গিলে ফেলি। মাছের কালিয়াটা বড়বুর হাতে চমৎকার হয়েছে।

ঠিক একই সময়ে মেজভাই বলে ওঠে, 'রাফিরা থেকে গেলে পারত।'

আমি অবাক হয়ে যাই। তাহলে মানুষের মনের টান বলে কিছু আছে? দু'ভাই এক সঙ্গে মনে করছি।

সুরাইয়া বলে, 'আমি খুব করে বলেছিলাম। থাকল না। বলেছিলাম আমি বাড়ি থেকে পারমিশান নিয়ে আসছি, থাকব। প্লিজ, থাকুন না। শুনল না।'

মেজভাই আরেকবার আমার দিকে নীরবে তাকায়। আমি জানি, সেই সোনার মোহরটা এখন মেজভাইয়ের মনের মধ্যে পূর্ণিমা হয়ে জ্বলছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করে না কেন? এই তো সকলেই এখন আছি, একসঙ্গে, এক জায়গায়। জিজ্ঞেস করলেই চুকে যায়।

মেজভাই জিজ্ঞেস করে না। আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। আমার মনের মধ্যে একটা বেয়াড়া কথা হঠাৎ রোঁয়া ফুলিয়ে দাঁড়ায়।

মোহরটা যদি মেজভাই নিজেই সরিয়ে থাকে? সোনার একটা আস্ত মোহর। কত দাম হবে? পাঁচ সাত দশ হাজার? পাঁচের নিচে তো নয়ই।

মিঠুয়া ধরেছে পুরনো সব নিয়ম যা আছে, বিয়েতে যা যা হয়, তার বিয়েতে হতে হবে। নিয়মে বলে, গায়ে হলুদের মাছ যে কুটবে মোহর থাক কি রুপোর টাকা থাক মাছের মুখে, সে পাবে। মেজভাই তো আর মাছ কুটবে না, অতএব সে পাবে না। তাই সে এক ফাঁকে সরিয়ে রেখেছে। ক'দিন থেকেই তো মিঠুয়া বিজ্ঞাপন দিচ্ছিল, মোহর আসছে মোহর আসছে।

আমার একটু ঘুম পাচ্ছিল। নতুন এই চিন্তাটায় ঘুম হবে গিয়ে সাফ।

হাত ধুয়ে ওপরে যাই। বড়বু জেগেই আছে। বড়বু পায়ের শব্দ পেয়ে ডাকে।

'শুনে যা।'

বড়বু কিছু বলার আগে আমিই একটা কথা বলি।

'বু' মিঠুকে তুমি একবার ডাকো তো।'

'কেন?'

হঠাৎ অন্ধকার মুখখানা আমার ভালো লাগে না।

'ডেকে একটু কথা-টথা বলো। বড় কান্নাকাটি করছে।'

কান্নার মাত্রাটা ষোল আনা ঠিক নয়। এবং মায়ের জন্যেই যে বিশেষভাবে কাঁদছে তাও ঠিক নয়।

বড়বু বলে, 'কাঁদুক। এত কান্ড করবে, চোখের একটু পানি ফেলবে না?' তারপর একটু থেমে যোগ করে, 'আমাদের তো ভদ্র ঘরের

বিয়ে, বাপের হাতে, আমরাই কম কেঁদেছি ? ওর হয়েছে কি ? ওর তো কেঁদে ভাসানো উচিত। লোক দেখানো দু'চার ফোঁটা ফেলছে। তার-পরেই হ সাহাসি। শুনছি না ? সন্ধ্যে থেকে শুনছি।'

'আহা, ছেলেমানুষ। বয়স বা কত ?'

'দ্যাখ তুই আমাকে রাগাসনে। ছেলেমানুষ ? কাজটা করছেন বুড়োর দাদীর মতো।'

আমি ইতস্তত করি। দাঁড়িয়ে থাকি। বুঝে পাই না কি আমার কর্তব্য।

'কই, ডাকলে কেন ?'

'বোস।'

'আবার বসতে হবে ?'

বসলাম। আর বড়বু কিছু বলে না। এ তো ভারী ঝকমারি হলো। রাত বারোটার সময় এইসব ভালো লাগে ? এখন গিয়ে শোবো-টোবো।

বড়বু হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'বাবা বেঁচে থাকলে বুক ফেটে মরে যেত। তার নাতনীর বিয়ে। এমনই বিয়ে মানুষের কাছে বলার মুখ নেই।'

আমি একটু ঝাঁজ মিশিয়ে বলি, 'এসব আজকাল কত হচ্ছে। মুখ নিয়ে কারো কিছু অসুবিধে হচ্ছে না।'

বড় কোমল গলায়, বাচ্চা একটা মেয়ের মতো বড়বু বলে ওঠে, 'আচ্ছা বল, এই একটা বিয়ে ?'

'দ্যাখো বু, এক কথা নিয়ে বড্ড প্যাচাল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। মোটে ভালো লাগছে না। তুমি ভালো করে জানো, এ বিয়ে ঠেকাতে পারবে না। তুমি নিজে মত দিয়েছ। তুমি নিজে স্বীকার করেছ, মিঠু যা চায় তাই হবে। বাড়িতেই বিয়ে হবে। নিয়ম মাফিক বিয়ে হবে। এখন তুমি ঘ্যানঘ্যান করলে তো চলবে না। আজ বাদে কাল বিয়ে। বিয়ের কথা হয়ে আছে মাসখানেক। এতদিন চুপ করে থেকে দুয়োরের কাছে এসে, কোনো মানে হয় ?'

চোখে পানি মোছে বড়বু।

আমি তার হাত ধরে বলি, 'আমি জানি তোমার কষ্ট হচ্ছে। খারাপ লাগছে। যত ঘনিয়ে আসছে, তত তোমার মন বেঁকে দাঁড়াচ্ছে। সব বুঝি। আমিও অনেক চিন্তা করে দেখেছি, কিছু পাইনি।

বুঝতেই পারলাম না কি করে কি হয়ে গেল। কি করে মিঠুর মতো বাচ্চা মেয়েটা ঐরকম একটা লোকের সঙ্গে ঐরকম একটা রিলেশন করতে পারল। আবার দ্যাখো, তুমি আমি পারছি না, মিঠুর বান্ধবীরা কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে। যেন এরকম দোজবরে বুড়োভামের সঙ্গে ষোলো বছরের মেয়ের হরহামেশাই বিয়ে হচ্ছে। দেখছ না, গায়ে হলুদে ওর বান্ধবীরা সবাই এসেছিল। সুরাইয়া বলে মেয়েটি বিয়ে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত থাকবে বলে বাড়ি থেকে চলে এসেছে। দিব্যি ঠাট্টা মশকরা সবই চলছে। কি করবে বলো ?'

বড়বু নড়েচড়ে বসে।

'আমি তাহলে শুতে যাই।'

নিষেধ না পেয়ে উঠে দাঁড়াই। তখন বাধা দেয় বড়বু।

'রাফিয়ার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল ?'

'আজ ? না। কই ? আমি তো বিকেলেই বেরিয়ে গেলাম। শুনলাম তার পরে এসেছিল।'

'তুই একটু বোস। মনোয়ারের যেমন মাথা গরম তাকে কিছু বলা যায় না। রাফিয়ার কথা। আমার একটু ভাবনা হচ্ছে।

বড়বুরও ? আমি তাড়াতাড়ি বসে পড়ি। জিজ্ঞেস করি, 'কেন বলো তো ?'

'না। কেমন যেন মনে হলো।'

আমি বুঝতে পারি, বড়বুর মনের মধ্যে কথাগুলো স্পষ্টই আছে, উচ্চারণ করতে পারছে না।

'কেমন মানে ?'

'ভালো ঠেকল না। তুই কি মাঝে মাঝে ওর বাড়িতে যাস ?'

'না, খুব কম। কই ? যাওয়া হয় আর কই ?'

'বেলায়েত শেষ করে এসেছিল ?'

'ও, দুলাভাই এসেছিল, হুঁ, তা প্রায় এক বছর। তোমার এত চিন্তা হচ্ছে কেন

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ছোট ভাইয়ের কাছে বিষয়টা তুলতেই পারছে না বড়বু। তাই মনে মনে এখন ঠিক করি, আমিই তুলব।

'হুঁ, বড়বু। ঠিক। আমিও তোমাকে বলতাম। মেজবুর চাল-চলন খারাপ মেয়ের মতো হয়ে গেছে।'

চমকে ওঠে বড়বু।

'কি? কি বললি, সানো?'

'খারাপ, খারাপ মেয়ে, বাজারের মেয়ে। আমি ভাই, আমার চোখেই অস্বস্তি লাগে।'

'তুই তাহলে লক্ষ্য করেছিস?'

'কবে।'

'আজ যেভাবে এসেছিল, না দেখলে কল্পনা করতে পারবি না। আর অত সেন্ট মাখে?'

'দুলাভাই যে মিডল ইস্ট থেকে আসে, আর প্লেনে দামী দামী পারফিউম কেনে। সেই সব।'

'ওর চোখ মুখও আমার ভালো লাগল না।'

'জানি। কিন্তু তুমি ভাবছ কেন? বিয়ে হয়ে গেছে। আমাদের কি দায়িত্ব? যা হয় ওর বর বুঝবে।'

কথাটা আমি বলি বটে, মনের ভেতর থেকে পুরোপুরি সায় পাই না। চেয়ারের চারটে পায়া মাটিতে ঠিক বসে না।

আমি কি বড়বুকে এখন বলব, যে, মেজবু বাড়ি ফেরেনি? বলব, তার শ্বশুর বাড়ির সবাই জানে, সে এখানে আজ রাতে আছে? না, থাক। তার নিজের মেয়েকে নিয়েই, বেচারা।

বড়বু একটা নতুন কথা হঠাৎ তুলে বসেন। আমার মাথাতেও আসেনি।

'আচ্ছা, তোর কি মনে হয়? রাফিয়ার কোনো হাত আছে মিঠুর এই বিয়েতে? মিঠুকে নইলে এত খারাপ বুদ্ধি কে দেবে? আজ বিকেলে রাফিয়াকে দেখেই আমার বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। তুই কি বলিস?'

আমি ভাবতে থাকি।

এরকম হতে পারে না?—মিঠুর লোকটাকে রাফিয়াই জুটিয়ে দিয়েছে? কিছুদিন থেকে রাফিয়ার মুখে নতুন নতুন লোকের কথা শুনতাম। অমুক ভাই, তমুক ভাই। মনসুর নামটা বলেছিল কিনা মনে করতে পারছি না।

অবশেষে আমি বলি, 'আচ্ছা না হয়, মেজবুর হাত ছিল, মেজবুই মিঠুয়াকে জুটিয়ে দিয়েছে, এখন সে ময়না তদন্ত করে লাভ? কোনো উপকার হবে?'

'আমার এখন মনে পড়ছে, বেশ কিছুদিন থেকে রাফিয়া আর মিঠুয়া- কি ভাব। আমি বলি, খালা ভাগনি। আমি আমার শতেক জ্বালায় মেয়ের দেখাশোনা করতে পারি না, রাফিয়ার কাছে মায়া পাচ্ছে, পাক। তলে তলে এই ?'

'আহ, তুমি তো ধরেই নিয়েছ দেখছি, মেজবুর হাত আছে।'

'আছে। আমি জানি, আছে।'

'কি বলছ ?'

'খালা ভাগনি জুটেছে ভালো। দুই মাগী।'

'ধেৎ।'

বড়বুর কাছে আর বসা যায় না। আমার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যায়।

'কি সব বলছ, বড়বু ? মেজবুর কথা জানি না, মিঠুয়াকে তো চোখের সামনে দেখছি। কি এমন খারাপ কাজ করেছে ? আর যদি খারাপ কিছু করেই থাকে বলে তোমার মনে হয়, মিঠুয়াকে তুমি দোষ দিচ্ছ কেন ? ষোলো সতেরো বছরের মেয়েকে ? তুমি দেখতে পাচ্ছ না পেছনে চল্লিশ বছরের লোক আছে ? সেই লোকটাকে তো তুমি কিছু বলছ না ? কেন বলছ না ? তুমি কি মনে করেছ, মনসুর সায়েব, তিনি জায়নামাজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন চব্বিশ ঘন্টা ? আমাদের মিঠুয়া গিয়ে তাকে খারাপ করেছে ? তিনি এতই সরল, দুর্বল, যে ষোলো বছরের একটা বাচ্চার কথাতেই ঢলে পড়েছেন ? আসলে জানো বড়বু, এই হচ্ছে আমাদের দোষ, আমাদের মহাদোষ- আমরা আসল লোকটাকে কেউ কিছু বলি না। তুমি কতটুকু জানো, মিঠুয়াকে ঐ লোকটা কি প্রলোভন দেখিয়েছে, কিভাবে পটিয়েছে, কেমন করে হাত করেছে ? জানো ? জানো কিছু ?'

ভয়ার্ত গলায় বড়বু প্রশ্ন করে, 'তুই তবে কিছু শুনেছিস ?'

বিস্তারিত শুনিনি। কিন্তু এখন সে কথা বললে আমার বক্তব্যের জোর কমে যাবে। আমি চুপ করে থাকি।

'কি শুনেছিস ?'

'ওসব এখন থাক, বড়বু। মনসুরটি হচ্ছে মনস্টার, বুঝেছ ? মনস্টারের ভালো কোনো বাংলা হয় না। যাকে বলে রাক্ষস, শয়তান। হি ইজ এ মনস্টার। তুমি জানো কি করে ওদের দেখা হয় ? জানো না। তবে শোনো।'

বড়বু বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকায়।

'ঐ যে ঘরে আছে সুরাইয়া, ঐ সুরাইয়ার বাবা মন্ত্রী থাকার সময় এই মনসুর সায়েবের একটা বিরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোন - আচ্ছা, সে থাক, এত তুমি বুঝবে না। সুরাইয়ার মারফত তোমার মেয়ের আলাপ হয় মনসুর সায়েবের সঙ্গে। প্রায়ই ওদের চায়নিজ খাওয়াতে নিয়ে যেত। গাড়িতে এদিক সেদিক নিয়ে যেত। সে সব ডিটেল শুনে তুমি কি করবে? তুমি শুধু শুনে রাখো, আমি মনে করি, মিঠুর কোনো দোষ নেই। মিঠু মনসুরকে দেখে কক্ষণো ভাবেনি যে, এই লোকটাকে পটাতে হবে। ভাবতেই পারে না। লোকটা তার বাপের বয়সী। লোকটার বউ আছে, বাচ্চা আছে। বরং মনসুরই মিঠুয়াকে দেখে ভেবেছে, মজা করা যাক। ফুর্তি করা যাক।'

'ছীছি।'

'কানে হাত দিলে চলবে কেন, বড়বু? মিঠুয়াকে দোষ আমি দিতে দেব না তোমাকে। তুমি শুনবে। লোকটার লোভ হয়। তোমার চটপটে চালাক চতুর ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখে, বুঝেছ? শয়তানি ফন্দী আঁটে মনসুর সায়েব। মিঠুয়া নয়। এগিয়ে যায় মনসুর সায়েব। মিঠুয়া নয়।'

দু'হাতে কান চেপে বসে থাকে বড়বু।

'বড়বু।' কোমল গলায় আমি বলি। 'শুয়ে পড়। রাত অনেক হয়েছে।'

দরোজা ভেজিয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে আসি।

এতক্ষণে আমার খেয়াল হয়, মিঠুয়ার ঘর খুব দূরে নয়, আমাদের কথাগুলো হয়ত ওদের কানে গেছে। আমি নিঃশব্দ পায়ে ওদের ঘর পর্যন্ত হেঁটে যাই। বাতি জ্বলছে। ভেতরে কি হচ্ছে বোঝা যায় না। আমি ফিরে আসি। আমি একবার নিচ থেকে ঘুরে আসি। সদর দরোজা বন্ধ আছে। মেজভাই কখন শুয়ে পড়েছে। রান্নাঘরের বন্ধ দরোজার সমুখে মিসরের স্ফিংকসের ভঙ্গিতে বেড়ালটা স্থাপিত হয়ে আছে। বারান্দার তার থেকে একটা কাপড় পতপত করে উড়ছে। এতক্ষণ পরে একটু বাতাস দিয়েছে। আরে, তাই তো। কি সুন্দর ঠান্ডা বাতাস যেন স্বচ্ছ একটা নদীতে আমাদের গোসল হয়ে যাচ্ছে।

আমি ঘরে এসে চোখ থেকে চশমা খুলে রাখি। সুরাইয়া ঠাট্টা করছিল কালো এই চশমা নিয়ে। জিয়াউর রহমানের চোখে কালো

চশমাটা কিন্তু ঠাট্টার নয়। তার প্রয়োজন ছিল। আমার প্রয়োজন অন্য রকম। চশমাটা আবার আমি চোখে দিই। আবার খুলে রাখি। একেবারেই সব খুলে টুলে শুয়ে পড়ব কিনা ভাবি।

মুখের ওপর আগুনের হল্কা এসে লাগে। জ্বালা করে। বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে। রোজ শুতে গেলে মিঠুয়া এসে আমার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে যায় কিছুক্ষণ। আজ আসবে না। আজ ওর গায়ে হলুদ হয়ে গেছে। কাল দিন পরে পর হয়ে যাচ্ছে। এখন কি আর মামার কথা মনে আছে তার?

আমার একা লাগার কথা। লাগে না। একটুও না। বরং আমি কোথাও কোনো কিছুর যুক্তি খুঁজে পাই না। ছাদে উঠে এসে ছায়াপথ আমার চোখে পড়ে। এতদূর থেকে স্বর্গের সড়কের মতো মনে হয়। আবার মনে হয়; দুধের নদী। নদী বললেও ঠিক হয় না, নহর বলতে হয়—দুধের নহর। কিন্তু ঐ নহরের ভেতরে কোটি কোটি আগুনের দলা—জ্বলছে, পুড়ছে, ঘুরছে; এতদূর থেকে বোঝা যায় না।

একটা পোড়া গন্ধ পাই। গন্ধটা পাই, কিন্তু গ্রাহ্য করি না। ঐ যে ছায়াপথের ভেতরে নক্ষত্রের আগুনের কথা ভাবছিলাম, পোড়া গন্ধটা ওরই সঙ্গে বেমালুম মানিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু না। নাকে বেশ লাগতে থাকে। আমি সিগারেট খাই না। সিগারেটের ধোঁয়া চট করে আমার নাকে ধরা পড়ে।

তাকাতেই, দূরে, পায়ের কাছে, অন্ধকারে, সিগারেটের এক ফোঁটা লালচে আলো চোখে পড়ে। সিঁড়ি ঘরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে কেউ। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

ফিসফিস করে ছায়া উচ্চারণ করে, 'এই।'

সুরাইয়া হাত তুলে আমাকে ডাকে।

'তুমি?'

'আবার কে? আমিই তো। বাপরে বাপ। একটু লুকোবার জো নেই।'

'লুকোবার দরকার কি? এত কিছুর সাহস আছে, সবার সামনে সিগারেট খাবার সাহাস নেই?'

'এমন ভাব করছেন যেন, আপনি দাদাঠাকুর। আপনাকে লুকিয়ে সিগারেট খেতে হবে?'

'লুকিয়েই তো খাচ্ছ। নইলে নিচেই খেতে।'

'একটা খান ?' প্যাকেটটা এগিয়ে দেয় সুরাইয়া।

'আমি খাই না।'

'একটা ? আমার অনুরোধে ?'

'না।'

'আচ্ছা, আপনি কোনোদিন খাননি ?'

'না।'

'ইচ্ছে করেনি ?'

'না।'

'আচ্ছা, আপনি মদ খেয়েছেন ?'

'না।'

'আমি খেয়েছি। একটু। একবার। বিয়ার। তেতো।'

'ও।'

'আপনি দেখছি একেবারেই ভেতো। কবিতা লেখেন, শুনেছি কবিরা নাকি মদ খায়। আপনার মদ খেতে ইচ্ছে করেনি ?'

'না।'

'চুমো খেয়েছেন কখনো ?'

'একটা চড় খাবে।'

'না, চড় খাবো না। অন্যকিছু খাবো।'

এরকম বদমাশ মেয়ে আমি দেখেনি। যা বলে বুঝে বলে কিনা জানি না, খুব ঝুঁকি নিয়ে বলে। আমার মনে পড়ে যায় মোহরটার কথা। সুরাইয়ার মতো মেয়ের পক্ষে, অসম্ভব নয় সরিয়ে ফেলা।

ব্যাপারটা পরীক্ষা করবার জন্যে আমি বলি, 'অন্য কিছু খাবে মানে, চুমো তো ?'

'বোঝেন তাহলে ?'

'হুঁ, পাগলেও বোঝে। বুঝব না কেন ? আসলে সুরাইয়া, তুমি কোনো কারণে আমাকে হাত করতে চাইছ। আমি ভাবছি, কারণটা কি হতে পারে ?'

'আপনার কি মনে হয় ?'

'আরে, সেটাই তো আমি বার করতে চাইছি।'

'দেখি আপনার অনুমানের দৌড়।'

একবার মনে করি, মোহরের কথাটা সরাসরি জিজ্ঞেস করি। ঝামেলা

চুকে যায়। সুরাইয়া না নিয়ে থাকলে মেজভাই নিয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি না। জিজ্ঞেস করলেই একটা রহস্য আর রহস্য থাকবে না। থাক, এই রহস্যটা না হয় থেকেই যাক।

'একটু বসবে ? এসো না ?' চৌকির ওপর বসতে বসতে আমি বলি।

'আমি তো বসেই আছি।'

'ওখান থেকে ওঠে এসে বোসো। আমার কাছে।'

সুরাইয়া হয়তো ভাবে, আমি ওকে চুমো খাবার আয়োজন করছি। সুরাইয়া ছাদের ওপর বসে সিঁড়ি ঘরে পিঠ ঠেকিয়ে মিটমিট হাসতে থাকে। তার মুখের ওপর রাস্তার বাতির আলো পাতাপত্তর ভেদ করে জালি কেটে রাখে।

'আচ্ছা, না হয় ওখানেই বসে থাকো।'

'মাইন্ড করলেন ?'

'আরে না। মিঠুয়া ঘুমিয়েছে ?'

'কখন। সত্যি আপনি মাইন্ড করেননি তো ?'

'আহা, মাইন্ড করব কেন ?'

'কি জানি, বাবা।'

'সুরাইয়া, তুমি আমাকে একটা কথা বলো। তুমি তো আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে মিঠুয়াকে ? মনসুর সায়েবের সঙ্গে ?

'জানেন তো সব। আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন ?'

'না, এমনি। এমনি আমার জানতে ইচ্ছে করছে দু'একটা কথা।'

'যেমন ?'

'মিঠু হঠাৎ বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠল কেন ? তুমি তো ওর প্রাণের বান্ধবী, তোমাকে কিছু বলেনি ? কি দেখল মিঠুয়া ? মনসুর সায়েবের কি দেখে সব ভুলে গেল ? টাকা ? চেহারা ? বাড়ি ? গাড়ি ?'

সুরাইয়ার সাহস মন্দ নয়। পা লম্বা করে আমার পায়ে ছোট্ট লাথি মেরে বলে, 'এত কিছু বললেন, আসল জিনিসটাই বাদ দিয়ে গেলেন

'আসল জিনিস ? কোনটা ?'

'কেন ? প্রেম। প্রেমের কথাটা আপনার মনে পড়ল না ?'

'প্রেম ?'

'হ্যাঁ, প্রেম। মিঠুয়া তো মনসুর সায়েবের প্রেমেও পড়তে পারে। পারে না ?'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। সুরাইয়া হঠাৎ চাপা স্বরে খিল-

খিল হেসে ওঠে। চোখ তুলে তাকাই।

'আসলে প্রেম আপনার চোখে পড়েনি কেন জানেন ? আপনার চোখে যে কালো চশমা।'

ছাদের ওপরটা অন্ধকার। চোখে আমার চশমা ছিল না, হাতে ছিল। ওর কথায় চশমাটা আমি পরেই নিই।

'আচ্ছা, এখন এখানে আপনার ডার্ক গ্লাস পরে লাভ ?'

আমি বিরক্ত হয়ে কঠিন গলায় বলি, 'ডার্ক গ্লাসের কথা হচ্ছে না, সুরাইয়া। মিঠুয়ার কথা আমি জানতে চাইছি। তুমি বলছ, মিঠুয়া মনসুর সায়েবের প্রেমে পড়েছে। এই তো ?'

'হ্যাঁ, বলছি তো। আর অবাক হচ্ছি, আপনি আপনার ভাগনির সম্পর্কে এত নিচু ধারণা করেন।'

'কি রকম ?'

'যে আপনার ভাগনি বাড়ি গাড়ি টাকা দেখে বিয়ে করছে।'

'জানো সুরাইয়া, আমার এক বন্ধু, কবি, ইব্রাহিম, নাম শুনেছ ?'

'না। কিম্বা, হয়তো।'

'যাকগে। আমার সেই বন্ধুর বড় ভাই ফিলম ডাইরেক্টর।'

'কি নাম ?'

'ও তুমি চিনতে পারবে না। সে বলে, প্রেম নাকি একটা কমোডিটি।

'কি ? কি ডিটি ?'

'কমোডিটি। কমোডিটি। পণ্য। বিক্রির মাল। জিনিস। বস্তু। যা কেনাবেচা করা চলে। যা লোকে কাজে লাগায়। আর কি ভাবে বলব ? লেখাপড়া তো তোমাদের ঐরকম।'

'লেখাপড়ার খোঁটা দেবেন না। বুঝেছি। কি বলতে চান, বুঝেছি। ফিলমের পরিচালক তো ? প্রেম বেচে খায়। টাকা বানায়। তার মুখে এর চেয়ে ভালো কথা আসবে কোত্থেকে ?'

হয়তো ঠিকই বলেছে সুরাইয়া।

'আপনি কি বলেন সুরাইয়া আমাকে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করে। 'আপনার কি মনে হয়, প্রেম আসলে কিছু না ? দোকানের মাল ?'

আমি উত্তর দিই না। প্রেমের তৃষ্ণা এখনো আমার পায়নি। মেয়ে দেখলেই প্রেমে পড়বার কথা আমার মনে হয় না। আসলে, প্রেম আছে বলেই আমার ধারণা হয় না।

'কই ? জবাব দিন।'

আবার পা দিয়ে খোঁচা দেয় সুরাইয়া। তবু আমি সাড়া দিই না।

'আপনি তো প্রেমের কবিতা লেখেন ?'

'লিখতাম।'

'মানে ?'

'এখন আর লিখি না।'

'কোথাও ছ্যাঁক খেয়েছেন ? তাই না

'দূর। এমনিই আর লিখি না। তোমার মনে আছে, সুরাইয়া ? একদিন তুমি দুপুরবেলায় আমার ঘরে এসে আবদার করেছিলে

'আবদার ? কিসের বলুন তো ?'

'প্রেমের কবিতার। একটা প্রেমের কবিতা চেয়েছিলে। তারপর তো দু'তিন বছর তোমার পাত্তাই নেই। এর মধ্যে কত কান্ড হয়ে গেল।'

'কত কান্ড মানে ?'

'না, তোমার কিছু না। আমি আমার কথা বলছি। সে থাক। সে শুনে লাভ নেই। আমি কিন্তু তোমার জন্য একটা কবিতা লিখে রেখেছিলাম।'

'তাই ? সত্যি ?'

'খুব মন দিয়ে লিখেছিলাম। আমার তখন বয়স কত আঠারো। সুকান্ত লিখেছে না ?—আঠারো বছর বয়স কি দুঃসহ। একটা মেয়ে আমাকে অনুরোধ করেছে, হোক ভাগনির বন্ধু, সম্পর্কে ভাগনি, হোক তার বয়স তেরো কি চৌদ্দ। আমি কবি, আমার কাছে চায় প্রেমের কবিতা। বুঝলে না ? খুব যত্ন করে লিখেছিলাম। কিন্তু লিখেই বুঝলাম, কিছু হয়নি। বেশি যত্নে করেছি তো, কিছু হয়নি।'

'তার মানে বেশি যত্ন না করলে কবিতা ভালো হতো ?'

'তাও ঠিক না, সুরাইয়া। আসলে, ফরমাশে লেখা যায় না। লিখতে হবে বলে লেখা, তা হয় না। তখন তুমি জিজ্ঞেস করছিলে আমার লেখার কথা। দু'তিন বছর তো তোমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। আর তুমিও হয়ত পত্রিকা টত্রিকা পড়ো না। আমি কিন্তু আর কবিতা লিখি না।'

'কবিতা লেখন না ? কেন ?' হাসতে হাসতে সুরাইয়া জানতে চায়। অবিকল, কেউ যদি বলে আমি মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছি, তখন লোকে যে গলায় কারণ শুধোয়, সেই গলা সুরাইয়ার এখন। আহত বোধ করা কি উচিত আমার ? আমার কিন্তু মজাই লাগে।

'কেন আবার কি ? লিখি না, লিখি না।'

'তবু। এই এতো লিখতেন, হঠাৎ কি হলো।'

আমার মনে পড়ে যায়। ইব্রাহিম। আজ বিকেলে। বলছিল, 'কি হবে কবিতা লিখে ?' আমাকে করুণা করে বলেছিল ? আমাকে খুশি করতে ?

আমি জানি কবে থেকে আমি আর লিখি না। দিন তারিখ স্পষ্ট মনে আছে। এমনকি সঠিক সময়টাও। ইব্রাহিম বোঝে কিনা জানি না। সুরাইয়াকে বললেও বুঝবে না।

হাই তুলে উঠে দাঁড়াই আমি।

সিঁড়ির দরোজায় দাঁড়িয়ে বলি, 'তাহলে তুমি বলছ, আমাদের মিঠুয়া সত্যি সত্যি প্রেমে পড়েছে। প্রেম ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কারণ নেই বিয়ে করবার ?'

সুরাইয়া উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে এসে বলে, 'সত্যি আপনি খুব খারাপ লোক। মনে করতাম, ভালো। তা নয়। ভাগনিকে পর্যন্ত সম্মান করেন না। মিঠুয়াকে আমি বলে দেব, তোর মামার ধারণা তুই নাকি টাকার লোভে বিয়ে করছিস।'

আমার ঘাড়ে ভূত চাপে হয়ত। বলে বসি, 'তোমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করে দেখো তো, কিসের লোভে তিনি দেশ সেবা করেন।'

'কি ? আবার বলুন।' হিসহিস করে ওঠে সুরাইয়া।

আবার বলার দরকার হয় না। নীরবতাই কথাটাকে নিয়ে আমাদের মাঝখানে দোলাতে থাকে।

সুরাইয়া বলে, 'চেঁচিয়ে উঠলে বিপদে পড়তেন। বাঁচিয়ে দিলাম।'

সে নিচে চলে যায়। আমি আমার সমস্ত কিছু কোলের পরে গুটিয়ে নিয়ে চৌকির ওপর আবার বসে পড়ি। কিশোরীর ওড়নার মতো ছায়া-পথ আমার মাথার ওপরে শূন্যতার ভেতরে, যেন বা হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। আমি অনেকক্ষণ বসে থাকি। আমি কারো আশায় বসে থাকি, তা নয়। আমি খুব বিচলিত বলে বসে আছি, তাও নয়। কত-গুলো দাগ খুব সহজে ধুয়ে মুছে উঠে যায়।

১০

আমার ঘুম তেমন গাঢ় নয়। সারারাতে কয়েকবার আমি এমনিতেই জেগে যাই। কখনো উঠে বসি। কখনো শুয়েই জেগে থাকি। আবার কখন ঘুম আসে, বুঝি না। আজ সারাটা রাত ঘুমোতে পারিনি। গরমে। আমার ছোট টেবিল ফ্যানটা চালাতে গেছি শুতে যাবার আগে, আচমকা নীল একটা আলো ছেড়ে সে থেমে গেল। তারপর থেকে শুধু এপাশ আর ওপাশ। আর মেজবুর মুখখানা বারবার। ঘুরে ঘুরে। বিরক্ত হয়ে যাই।

আমার ঘরের বেশিরভাগ জিনিস মেজবুর বরের দেয়া। টেবিল ফ্যান। টুইন ওয়ান। স্টিলের ওয়ার্ডরোবটা যদিও আমার নয়, আছে আমার ঘরেই। চাবি থাকে মেজবুর কাছে। ওর ভেতরে মিডল ইস্টের আর কত দ্রব্যসামগ্রী আছে কে জানে। মাঝে মাঝে আসে আর এটা ওটা বের করে নিয়ে যায়। শ্বশুর বাড়িতে সবকিছু রাখা নাকি ঠিক না।

আমার তো এখন মনে হয়, মেজবু তার আসল যা কিছু সব সরিয়ে এনে এই স্টিলের আলমারীতে পুরে রেখেছে, যাতে কেটে পড়তে হলে চট করে কাটা যায় শ্বশুর বাড়ি থেকে।

সুখী নয় মেজবু? শাড়ি কাপড় গয়না টয়নার ঝোঁক ছিল। বেলায়েত দুলাভাই তো মিডল ইস্ট থেকে কম সাপ্লাই দিচ্ছে না? সিনেমায় নামার ইচ্ছে ছিল, তাও শুনছি হয়ে যাচ্ছে। তবে?

তবে-টবে যাই হোক, খোঁজ একটা নেয়া দরকার। শেষ রাতে, তন্দ্রার

ভেতরে, আমি ঠিক করে ফেলি যে মেজবুর শ্বশুর বাড়িতে যাবো। যদি মেজবুকে সেখানে পেয়ে যাই তো ভালো, আর না পেলে বলব - মেজবু আমাদের ওখানেই আছে, অমুক জিনিসটা চেয়ে পাঠিয়েছে, নিতে এসেছি। ব্যাস, চুকে গেল। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

খুব ভোরে উঠেই তৈরি হয়ে নি আমি। মেজবুর জন্যে অস্থির হয়ে এত ভোরে তৈরি হয়েছি, তা নয়। বাড়িতে সুরাইয়া আছে, তার আগেই গোসলখানার ব্যাপার সেরে রাখা। নিচে নেমে চায়ের পানি চাপাই।

'বড়বু ?'

মেজভাইয়ের গলা।

'না, আমি।'

'ও। কি করছিস ? চা ?'

'তোমাকে দেবো তো ?'

'দিস। ভালো ঘুম হলো না। শেষ রাতে ছুটে গেল। তুই কিছু শুনেছিস ?' মেজভাই চোখ ডলতে ডলতে এসে রান্নাঘরের দরোজায় দাঁড়ায়।

'কি শুনব ?'

'গুলিগোলার আওয়াজ ?'

'যাহ্।'

'মনে হলো ব্রাশফায়ার, বেশ কয়েকবার। তারপর পটকার মতো আওয়াজ। আবার রাইফেলের আওয়াজও যেন পেলাম।'

'ও তুমি স্বপ্নে শুনেছ। কোথায় কি। আমিও তো জেগেই সারা-রাত।'

মেজভাই চিন্তিত মুখে ঘরে ফিরে যায়।

চা বানাতে গিয়ে সুরাইয়ার কথা মনে হয়। তার জন্যেও এক কাপ বানানো দরকার কিনা বুঝতে পারি না। বাড়িতে অতিথি। মিঠুয়ার বান্ধবী। ও ছাড়া এই সময়ে মিঠুয়াকে কে আর সঙ্গ দিচ্ছে ? এক কাপ চা-ই তো। ওপর থেকে ঘুরে আসি। জানালা আধ খোলা। দুটিতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুম ওদের ক্রীতদাস। বাঁচা গেল। সুরাইয়ার জন্যে চা বানাবার দরকার নেই। নইলে যেভাবে কাল রাতের সাক্ষাৎ শেষ হয়েছে, এই ভোরে চায়ের পেয়ালা নিয়ে দুয়ারে দাঁড়ালে কি হতো বলা যায় না।

মেজভাইকে চা দিই। সে তার চৌকির ওপর চিন্তিত মুখে বসে আছে। মাটির দিকে তাকিয়ে। আমি আমার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিই দরোজায় ঠেস দিয়ে।

বলি, 'তুমি দেখছি চিন্তিত হয়ে পড়লে।'

মেজভাই মাটির দিকে তাকিয়েই বলে, 'পষ্ট গুলিগোলার আওয়াজ পেলাম। তুই বলছিস, আমার মনের ভুল। বলছিস তুইও জেগে ছিলি, কিছুই শুনিসনি। এ কেমন হলো ?'

সহজ করে দেবার জন্যে আমি তখন বলি, 'হয়ত হয়েছে গুলি-গোলা, আমিই শুনতে পাইনি। আজকাল গুলিগোলা আর নতুন কি ? সব পাড়াতেই শোনা যায়। ইউনিভার্সিটির দিকে যারা থাকে তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো। যারা বনানী টনানীর দিকে থাকে, তাদের কাছে শুনো।'

'না, সানো, না। কথা সেটা না। আমার কথা হচ্ছে, আমি নিজেই বেশ ভালো বুঝতে পারি, বাইরে কিছু না, আমার মনের মধ্যেই গুলি-গোলা চলে, সেইটে আমি সত্যি বলে মনে করে উঠি। সত্যি আর কল্পনা আমার গুলিয়ে যায়। বাইরে আজকাল আকছার গুলিগোলা হয় আমি জানি। এটা সে গুলিগোলা নয়। এ আমার মনের মধ্যে। কিন্তু কেন ?

'হয়ত, একাত্তরে যে যুদ্ধ করেছিলে, তোমার স্মৃতির মধ্যে আবার সেটা। এরকম তো হয়।'

'হলে নতুন নতুনই তো বেশি হবে। গোড়ার দিকে হবে। তাই না ? প্রথম দিকে তো এরকম হয়নি। এখন এই পাঁচ সাত বছর থেকে। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, খুব যুদ্ধ হচ্ছে, অ্যামবুশ হচ্ছে, আবার যেন সব মিলিয়ে যায়। কোথাও কিছু না।'

'তোমার চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'চা-টা ভালো বানিয়েছিস। প্যান্ট পরেছিস যে ?'

'বাড়িতে মেহমান আছে। আবার একটু বেরুবো। তাই।'

আমি বুঝতে পারি আমার সঙ্গে এখন যে কথাগুলো বলছে মেজভাই এ কথাগুলো সে বলছে না, তার ঠোঁট বলছে। মনের মধ্যে আগের প্রসঙ্গই ঘুরছে।

মেজভাই হঠাৎ বলে, 'আমরা যুদ্ধ করেছিলাম কেন জানিস ?'

আমি চুপ করে থাকি। চায়ে চুমুক দিই।

'অন্য পরের কথা জানি না। আমি আমার কথা বলতে পারি। যুদ্ধ করেছিলাম দেশটাকে পাকিস্তানীদের হাত থেকে মুক্ত করতে। সেইটে ছিল খুব বড় করে আমার চোখের সমুখে। যেভাবেই হোক ওদের তাড়াতে হবে, খতম করতে হবে। আর সেই সঙ্গে মনের মধ্যে আবছা একটা ধারণা ছিল, দেশ যখন মুক্ত হবে, আমাদের সবার ভালো হবে, মানুষের দুঃখ কষ্ট থাকবে না এমন একটা ব্যবস্থা হবে।'

'ফিরে এসে তুমি তো সমাজতন্ত্রের কথা খুব বলতে।'

'তোর মনে আছে মেজভাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!

'একটু একটু আছে তো।'

'একাত্তরে তুই কত ছোট, তাই মনে আছে?'

'বাহ্ থাকবে না? বড়বু তখন মিঠুকে নিয়ে চলে এসেছে। তুমি বড়বুকে বলতে, দুঃখ কষ্ট কিছু থাকবে না, সমাজতন্ত্র আসছে। আমি মনে করতাম, সমাজতন্ত্র বুঝি কোনো মানুষের নাম। সে আসছে। আমি তার চেহারাটা কল্পনা করতে চেষ্টা করতাম। অনেকদিন পর্যন্ত আমি মনে করতাম, সমাজতন্ত্র আসছে মানে সেই লোকটি আসছে, বড় বড় পা ফেলে, বড় সড়ক দিয়ে। তারপরে তো বড় হয়ে বুঝলাম, আমি সেদিন সত্যিই ছোট ছিলাম। এখনো ভাবলে হাসি পায়।'

মেজভাই আমার হাতে চায়ের কাপ ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'বাংলাদেশ আমরা স্বাধীন করেছি বটে, পাকিস্তানীদেরও তাড়িয়েছি, কিন্তু নামেই বাংলাদেশ, আগের সেই পাকিস্তানের সঙ্গে একটু তফাৎ নেই, সব সেই আগের মতো। আগে শোষণ করত পাঞ্জাবীরা, এখন বাঙালীরাই সে কাজটি করছে, আর পাছে কেউ তাদের বাঙালী বলে ভুল করে, গরীব বাঙালীর সঙ্গে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়, তাই ওপর তলার বাঙালী এখন শালোয়ার-কুর্তা ধরেছে। জিয়াউর রহমানের বাংলা শুনেছিস তো? ব্যাপারটা ধরিয়ে দিয়ে যান উনি। ওপর তলার বাঙালী এখন এমনভাবে বাংলা বলে, মনে হয় মাতৃভাষা নয়, বাংলাটা বিদেশী কোনো ভাষা, পরে শিখেছে।'

আমি জানি, আমি বেশ বুঝতে পারি, মেজভাই উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। এটা তার রক্তচাপের জন্যে ভালো নয়। এই রক্তচাপের গোলমাল নিয়ে দু'দুবার ডাক্তার হয়ে গেছে। মেলা টাকার ওষুধ গিলতে হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে থামাবার কোনো কায়দা পাই না।

কিন্তু এখনো স্ববশে আছে মেজভাই। বেশ শান্তস্বরেই আমাকে

বলে, 'সমাজতন্ত্র আসবে। আসতেই হবে। মানুষ যেভাবে সবদিক থেকে সর্বস্বান্ত হচ্ছে, ঘাবড়াবি কেন? সমাজতন্ত্রের জমি তৈরি হচ্ছে। সমাজতন্ত্র আসছে মানে কি? বাইরে থেকে কি আসছে? না। এসব ভেতর থেকে আসে। ভেতর থেকে হয়। মানুষের ভেতর থেকে। মানুষের ইতিহাসের ভেতর থেকে। আমি আশা হারাই না। তোরা হাল ছেড়ে দিস, তোরা হায়-হায় করিস, তোরা নিজেদের সব ব্যর্থতার জন্যে দেশটাকে ইতিহাসটাকে দায়ী করে দায়মুক্ত বোধ করিস, আমি করি না। আমি তৈরি আছি। আমি খুব তৈরি। আবার তুই দেখবি, তোরা ইয়াংম্যান, তোদের আগে আমিই নেমেছি রাস্তায় আমার হাতে অস্ত্র, আমি দিয়েছি বুক পেতে।'

বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা যায়। এ রাস্তায় খুব একটা গাড়ি চলাচল করে না। আমরা দু'জনেই কান খাড়া করি। কিছুক্ষণ কোনো শব্দ হয় না। মেজভাই আবার মুখ খুলতে যাবে, আবার বেজে ওঠে হর্ণ। এমনভাবে বেজে ওঠে, পথচারীকে সতর্ক করবার জন্যে নয়, বরং যেন সংকেত পাঠাচ্ছে।

দোতলার রেলিং থেকে সুরাইয়ার গলা শোনা যায়। নিচে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'এই যে। শুনছেন।'

আমি উঠোনে নেমে আসি। ওপরে তাকাই।

'একটু দেখবেন? রাস্তায় গিয়ে? বোধহয় আমার গাড়ি।'

আমি তাড়াহুড়ো করি না। চায়ের কাপ দুটো রান্নাঘরে নিয়ে রাখি। এটা ওটা নাড়াচাড়া করি। সুরাইয়ার অনুরোধ পালন করবার জন্যে আমাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

'কি হলো ওওও।'

ওপর থেকে সুরাইয়া এমনভাবে তাড়া দেয় যেন সে অতিথি নয়, এ বাড়িরই মেয়ে।

আমি সদর দরোজা খুলে, একটু দূরে, উল্টোদিকের দেয়ালের সঙ্গে ঘেঁষে পার্ক করা, ঝকঝকে নতুন লাল একটা গাড়ি দেখতে পাই।

গাড়ির ভেতরে সান গ্লাস পরা মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোক। ঠোঁটে চিকন চকচকে মৃদু হাসি। আমার চোখের সান গ্লাস তার সান গ্লাসের সঙ্গে দূর থেকেই এঁটে আটকে যায়।

লোকটিকে আমি চিনতে পারি, কিন্তু না চেনার ভান করি। লোকটি এই ভোরে এখানে কেন? আমি বেশ অবাক হয়ে যাই।

লোকটি আমাকে হাত তুলে ইশারা করে ছোট্টভাবে। ইশারাটির অনুবাদ—একটু এদিকে এসো তো।

আমি গ্রাহ্য না করবার সিদ্ধান্ত নিই। জিয়াউর রহমানের মতো আমারও কাজে লাগে আমার চোখের ওপরে সানগ্লাসটি। আমি ভান করি, তাকে আমি দেখতে পাইনি। আমি বাড়ির ভেতরে ফিরে যাই।

সিঁড়ির মাঝপথে সুরাইয়া। ঘুমে ফোলা চোখ। পরনে কাল সারাদিনের পোশাক, মুচড়ে কুঁচকে বাজে দেখাচ্ছে। সুরাইয়া এক হাতে চুল ক্রমাগত পেছনে ঠেলছে।

আমাকে দেখেই সে বলে, 'আমার গাড়ি তো ?'

আমি তার উত্তর না দিয়ে ওপরে উঠে যাই।

এবং মিঠুয়ার ঘরের ভেতরে যাই। বোধহয় অবাক হয়ে আমাকে অনুসরণ করে সুরাইয়া। কারণ, সে ভাবতেই পারে না তার কথার কোনো উত্তর আমি দেব না।

মিঠুয়া আমার পায়ের শব্দে চোখ খোলে। আমি তার দিকে সরাসরি তাকিয়ে গম্ভীর ও নিস্পৃহ স্বরে বলি, 'মিঠু, তোর মনসুর সায়েব এসেছে।'

মিঠুয়া আমাকে চমকে দিয়ে ঠান্ডা গলায় বলে, 'জানি।'

জানে ? জানবে তো নিশ্চয়ই। মনসুর সায়েবের গাড়ির হর্ণ তার না চেনার তো কথা নয়। কিন্তু অবাক হলো না যে বিয়ের আগের দিন বর কেন এসে কনের বাড়িতে উপস্থিত ? আর মিঠুয়া যদি জানেই যে মনসুর সায়েবের গাড়ি, তাহলে সুরাইয়া যখন 'আমার গাড়ি আমার গাড়ি' বলে বাড়ি মাথায় করছে তখন তাকে থামায়নি কেন ?

মেজভাই খুব মন্দ বলেনি। আজকালকার এই মেয়েরা লাইফ হেল করে ছাড়বে।

মেজভাই আমাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কার গাড়ি ?'

আমি তাকেও কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিই। আমি সদর দরোজার দিকে হাঁটতে থাকি।

পেছন থেকে মেজভাই বলে, 'কি ? তোর জন্যে কেউ ?'

আমি সে কথারও উত্তর না দিয়ে সাধারণভাবে এই বাড়িটাকেই বলি, 'আমি বাইরে যাচ্ছি' এবং বেরিয়ে যাই।

মনসুর সায়েব এখনো গাড়ির ভেতরেই বসে আছে। এক হাত স্টিয়ারিং হুইলে, আরেক হাত জানালায়। আগে ছিল ঠোঁটের ওপর চিকন হাসি, এখন সেখানে চিকন লম্বা কালো সিগারেট। টানছে না। নীল সূক্ষ্ম ধোঁয়া লোকটার চেহারা ঘিরে বেড়াচ্ছে।

আমি ভেবেছিলাম সদর দরোজা খুলে সোজা বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যাব। যেন আমাদের বাড়ির সমুখে কোনো লালগাড়ি নেই, আমাদের বাড়ির কারো জন্যে কেউ অপেক্ষা করে নেই। কিন্তু পারা গেল না। কোনো কোনো কাজ শরীরের ভেতরে আরেকজন করে কিম্বা করিয়ে নেয়। আমি সদর দরোজার পরেই যে পৈঠা, সেই পৈঠার ওপর এক পা আর রাস্তার ওপর আরেক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে যাই। আমার শরীর এক মুহূর্তের জন্যে যেন হাঁটা ভুলে যায়।

কট করে একটা শব্দ হয়। লাল গাড়ির দরোজা খুলে যায়। শাদা ঝকঝকে ট্রাউজার পরা একটা পা বেরিয়ে আসে।

আমি পৈঠা থেকে পা নামিয়ে রাস্তায় এবার দু'পা রাখি।

গাড়ির ভেতর থেকে দ্বিতীয় পা এবার প্রকাশিত হয়।

আমি বড় রাস্তার দিকে মুখ ফেরাই।

মনসুর সায়েব গাড়ির বাইরে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়।

আমি এগিয়ে যাই। আমি বড় রাস্তার দিকে যেতে চাই। কিন্তু আমি নিজেকে এখন মনসুর সায়েবের সমুখে স্থাপিত দেখতে পাই।

কিম্বা আমার সমুখে নিঃশব্দে সে-ই এসে দাঁড়ায়।

'মামা, চিনতে পারছ ?'

লোকটির স্পর্ধা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। স্তম্ভিত হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার মতো ভদ্রলোকের পক্ষে আর কিছু করবার নেই। সে আমাকে জীবনের প্রথম সাক্ষাতে অবলীলাক্রমে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে পারল ?

'আমি মনসুর। ডিস্টার্ব করবো না। ছোট্ট একটা দরকারে এসেছি। একটা কথা আমার জানা দরকার। না, না, ভেতরে যাবো না।'

আমি কিন্তু তাকে ভেতরে আসতে অনুরোধ করিইনি, ভাষায় তো নয়ই, ইশারাতেও নয়।

'এখানে দাঁড়িয়েই সেরে নেবো। তবে কথাটা কি তোমাকে জিজ্ঞেস করব, না তোমার মেজ ভাই, মানে মনোয়ার মামাকে, বুঝতে পারছি না।' একটু উঁ-আঁ করে মনসুর আবার বলে, 'কাল আমি একটা লোক

দিয়ে এখানে পাঠিয়েছিলাম। তখন বাসায় তুমি ছিলে ?'

লোক মানে তো সেই লোক, যে লোক বিয়ের খরচ বাবদ টাকা এনে মেজভাইয়ের হাতে দিয়ে যায়। বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে, একটুও অপ্রতিভ না হয়ে, কথাটা উচ্চারণ করতে পারল লোকটি ?

আমি তাকে এক ঝটকায় বুড়ো আঙুল উল্টে তুলে আমাদের দরোজার দিকে দেখিয়ে বলি, 'ভেতরে জিজ্ঞেস করুন।'

আমি আর দাঁড়াই না। এগিয়ে যাই। জিয়াউর রহমান খুব উপকার করতেন যদি সান গ্লাস ছাড়াও এমন কিছু একটা ধরিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন, যাতে সমুখে তাকিয়ে পেছনেও দেখা যায়। তাহলে দেখতে পেতাম, মনসুর সায়েব এখন কি করছে।

না, পেছন ফিরে তাকাব না। আমি হন হন করে সমুখে এগিয়ে যাই। বাঁক নিই। বড় রাস্তায় পড়ি।

১১

অনেক দিন পরে মেজবুর বেডরুমে ঢুকি। লম্বা টানা বারান্দা। তার শেষ মাথায় ঘর। বড় বড় জানালা। বড় বড় পাতার ছবিঅলা পর্দা, জানালায়, দরোজায়। কাঠের মাজাভারী ওয়ার্ডরোব, পালিশে জিলিক দিচ্ছে। ওয়ার্ডরোবের মাথায় বিদেশী বড় বড় সুটকেশ। টেবিলের ওপর জাহাজের মতো প্রকান্ড ক্যাসেট প্লেয়ার। এক দেড় হাত লম্বা পুরু কাচের ফুলদানি গোটা কয়েক। চীনা মাটির পুতুল যুবতী, তার গা থেকে কাপড় খসে পড়ছে, এক হাতে কাপড় ধরে আছে, আর এক হাতে হাতরুটির মতো গোল ঘড়ি। বিছানায় ভেল-ভেটের জংলী বেডকভার। দেয়ালে বু-দুলাভাইয়ের রঙগীন বিরাট ছবি সোনালী চওড়া ফ্রেমে বাঁধানো। সারা ঘর গমগম করছে।

মেজবু আমাকে সোজা ঘরে টেনে নিয়ে যায় দেখে আমি অবাক হই। তারই কি কোনো গোপন কথা আছে আমাকে বলতে চায় ?

'বাইরেই বসি না ?'

'না। বেডরুমে আয়। আমার বেডরুম ছাড়া পুরো বাড়ি আমি ওদের ছেড়ে দিয়েছি।'

'ওদের মানে ?'

'আমার ননদ আর তার বরকে, আমার দেওরকে।'

'ঝগড়া টগড়া ?'

'সে অনেক কথা।'

বেডরুমটিকে কোনো গৃহিণীর ঘরের চেয়ে রক্ষিতার বাসর বলে

বেশি মনে হয়। বসবাসের চেয়ে যৌনতার ঘ্রাণ সবখানে। সবচেয়ে অশ্লীল লাগে, এর ভেতরে দামী একখানা জায়নামাজ—আলনায় ছবির মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

দরোজায় পর্দা ভালো করে টেনে দিয়ে মেজবু বলে, 'কি ব্যাপার? দেখা নেই, দেখা নেই, হঠাৎ পরপর দুবার?'

আমি চট করে উত্তর দিই না। ইচ্ছে করে ঠোঁটে রহস্যের ছোঁয়া ঝুলিয়ে সান গ্লাসের ভেতর দিয়ে মেজবুকে দেখতে থাকি।

'অ্যাঁ? ব্যাপার কি?' থাকতে না পেরে মেজবু আরেক বার চোখে টুসকি তুলে শুধোয়।

তবু চুপ করে থাকি। অভিনয়টা করতে আমার একটু কষ্টই হয়। কিন্তু এখনো মনস্থির করতে পারছি না যে ওকে কোন দিক থেকে ঘায়েল করব।

'বারে। চুপ করে আছিস যে?'

আর টাইম নিলে বিগড়ে যেতে পারে। যা থাকে বরাতে বলে ঝুলে পড়ি।

টানা গদ্যে বলে যাই, 'আমার কিছু টাকা দরকার। হাজার খানেকের মতো। আজকে।'

'কত?'

'শুনেছ তো।'

সান গ্লাসের ভেতর দিয়ে দেখি মেজবু তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে দেখছে। মাপতে চেষ্টা করছে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ওজন, সব নিচ্ছে।

'তো?' ছোট্ট করে আমি শব্দের খোঁচা দিই।

এই আমার পরীক্ষা। মেজবু যদি টাকাটা ফেলতে রাজী হয়ে যায়, বুঝতে হবে গোলমাল। আমি যে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি সব জানি ভান করে, এতে ঘাবড়ে গেছে। মনে পাপ আছে। টাকা দিয়ে হাতে রাখতে চাইছে।

মেজবু সমানে সমান যাচ্ছে দেখি। এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে কিছু বলছে না।

আলতো করে আমি উচ্চারণ করি, 'খুব সামান্য টাকা কিন্তু।' অর্থাৎ আমি ইঙ্গিত করি যে, যা লুকোতে চাইছ তার তুলনায় হাজার টাকা কিছুই না।

মেজবুও কম ঘুঘু নয়। ল্যাজে খেলতে থাকে।

'টাকা তোকে দিতে হবে কেন ?'

'সে তুমি ভেবে দ্যাখো।'

'কবে থেকে হাজার টাকা সামান্য টাকা হলো শুনি।'

'যবে থেকে মিডল ইস্টে স্বামীরা প্রবাসী হয়েছে।'

'তোর ধারণা, দুলাভাই আমাকে লাখ লাখ টাকা দিচ্ছে ?'

'আমার ধারণা, দুলাভাই তার চেয়েও দামী কিছু তোমাকে দিচ্ছে। স্বাধীনতা।'

'স্বাধীনতা ?'

'আশা করি ব্যাখ্যার দরকার হবে না।'

'তুই আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা নিতে এসেছিস ? তুই না আমার মায়ের পেটের ভাই ?'

আমি উঠে দাঁড়াই। জিজ্ঞেস করি, 'ভয় দেখিয়ে টাকা নিতে এসেছি, এই কথাটা মনে হলো কেন, আমার মনে যদি পাপ না থাকবে ? তুমি জানো আমি মোটেই ঘোরপ্যাঁচ পছন্দ করি না। সোজাসুজি কথা বললে দু'জনেরই সময় বেঁচে যায়। আমি তোমার নামে খুব খারাপ—খারাপ কথা শুনেছি।'

'কাল তুই এই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলি ?'

'কাল তো তুমি কানের কাছ থেকে বেঁচে গেছ। যদি বলতাম, আমাদের বাড়ি থেকে কখন বেরিয়ে এসেছ, কোথায় থাকত তোমার মুখ ?'

'তুই যাবার পরপরই আমি ফিরে আসি।'

'মাঝখানে ঘন্টা তিনেকের হিসেব কে দেবে ?'

'হিসেবটা চায় কে শুনি ?' মেজবু প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

'ধরো, আমি চাই।'

'তুই আমার গার্জেন ?'

'ধরো, তোমার স্বামী এসে চাইল।'

মেজবু টপ করে দু'হাতে মুখ ঢাকে। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ নিশ্চল পড়ে থাকে। তারপর মুখ তুলে শান্ত গলায় জানতে চায়, 'তুই আমার নামে কি খারাপ কথা শুনেছিস ?'

'তুমি সিনেমায় নামছ।'

'সিনেমায় নামা খারাপ ?'

'সে কথা বলছি না। যে তোমাকে নামাচ্ছে সে লোকটা খারাপ।

সে লোকটা মা বোন মানে না।'

হেসে ফ্যালে মেজবু। 'একটা লোককে খারাপ বল, এত খারাপ বলতে নেই।'

আমি অপ্রস্তুত গলায় বলি, 'তোমার কাছে সব কথা সোজা তো আর বলা যায় না। মা-বোন একটা কথার কথা। লোকটা ভালো নয়। তার ভাই আমার বন্ধু। তার ভাই আমাকে যা বলেছে তোমাকে বলতে পারব না। বড়বু পর্যন্ত বলছিল, তোমার হাবভাব ভালো না। বড়বু তো সন্দেহ করে, মিঠুয়ার এই বিয়ের পেছনে তোমার হাত আছে। তুমি মিঠুয়াকে নষ্ট করেছ।'

'এতদূর ?'

'হ্যাঁ, মেজবু, এতদূর।'

'তাই জানতে এসেছিস ?'

'জানতে এসেছিলাম কাল। আজ এসেছি দেখতে, যে, কাল রাতে তুমি বাড়ি ফিরেছ কিনা।'

'আজ জানতে চাস না আমি খারাপ না অন্য কিছু ?'

আমি চুপ করে থাকি।

মেজবু আবার বলে, 'আমি পুতুল ? আমার সময় কাটে কি করে বল ? বছরে সে আসবে এক মাসের জন্যে, বাকি এগারোটা মাস আমি এই ঘরের ভেতরে বন্দী হয়ে থাকি, এই তো ? শাড়ি, জামা, গয়না, সেন্ট, লিপস্টিক—সুটকেশ ভর্তি করে এনে দেবে; আমার জন্যে আনবে, আমি ব্যবহার করতে পারব না, ব্যবহার করলে আমি নষ্ট, আমি ছেনাল, আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া যে আমার স্বামী এখানে নেই। এদিকে আমাকে একা পেয়ে আমার গায়ে হাত দেবে আমারই দেওর ?'

আমি চমকে উঠি।

'সুলতান ?'

মেজবু আঁচল দলা করে মুখে চাপা দেয়। আরো কিছু বলতে চেয়েছিল, কথাগুলো কবর দিয়ে দেয়। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে সকল বস্তু নিস্প্রভ বলে আমার বোধ হয়। ওয়ার্ডরোব, সুটকেশ, ক্যাসেট প্লেয়ার, ফুলদানি, পুতুল, ঘড়ি, জায়নামাজ—বড় করুণ একটি গ্রন্থনায় আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার চোখে পানি এসে যায়। আমি মুখ আড়াল করে সান গ্লাস তুলে ক্ষণেকের জন্যে রুমাল

চাপা দিই। মেজবু আঁচলের দলার ভেতর থেকে বলতে থাকে, 'আমি একটু সাজতে গুজতে ভালোবাসি, বেড়াতে ভালোবাসি, হৈ চৈ ভালোবাসি, দোষ তো আমারই। মেয়ে হয়ে জন্মেছি যে। তুই পর্যন্ত, বড়বু পর্যন্ত, বিশ্বাস করে বসে আছিস আমি খারাপ। আমার নিজের ভাইবোন। আমার স্বামীর ভাই তো গায়ে হাত দেবেই, তার দোষ কোথায় ?'

আমার ভীষণ অপরাধাবোধ হতে থাকে। একটু আগে এই ঘরটিকেই তো রক্ষিতার ঘর বলে মনে হচ্ছিল আমার। এখন এক কারাগার ? সুন্দর সৌখিন জিনিস দিয়ে সাজানো এক ডেথসেল ? সুলতান, মেজবু'র দেওর ?

'মেজবু।' কি বলব বুঝে পাই না। বলি, 'পানি হবে ? ঠান্ডা ?'

ঘরের ভেতরেই দোতলা সবুজ ফ্রীজ; নিখুঁত, নতুন। পানি ঢেলে দেয় মেজবু।

'কিছু খাবি ?'

'না। সব বুঝি এখন তোমার এই ঘরেই ?'

'হ্যাঁ, এই ঘরেই। ওরা যা বলে বলুক, ভাবে ভাবুক, আমি এখনো আমার মতো। বাড়িতে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত তুলে দেবার চেষ্টা করছি। এবার তোর দুলাভাই এলে সাফ সাফ তাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, তারপর যা ডিসিশান নেবার নেবো। আমি টাকা চাই না, জিনিস চাই না, সোনাদানা কিচ্ছু না। সামান্য হলেই আমার চলে যায়। আমি সুখ চাই, শান্তি চাই, জীবন চাই, যার একটাও টাকায় মেলে না।'

মিঠুয়ার কথা মনে পড়ে যায়। মিঠুয়া মনসুরের টাকা দেখে ভুলেছে, এখনো আমার তাই মনে হয়। সুরাইয়া যতই বলুক, প্রেম; বাজে কথা। আমি একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করি, মেজবু সুখের কথা বলেছে, শান্তির কথা বলেছে, জীবনের কথা বলেছে, কিন্তু প্রেমের কথা বলেনি। মেজবু বলেনি, সে প্রেম চায়। প্রেম করেই তো বিয়ে করেছিল মেজবু ? সে প্রেম গেল কোথায় ?

'দুলাভাইকে তুমি ভালোবাসো, মেজবু ?'

'এত খোঁজ নিয়ে দরকার ?'

'তোমরা তো প্রেম করে বিয়ে করেছিলে।'

'তখন কি আর প্রেম বুঝতাম ? এখনো বুঝি না।'

আমার সন্দেহ হয়, আমারই মতো মেজবুও মনে করে—প্রেম বলে কিছু নেই। মেজবু না হয় প্রেম করে বিয়ে করে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সিদ্ধান্ত একটা করেছে। আমি? আমি তো প্রেম করিনি আজ পর্যন্ত। আমার একমাত্র প্রেম ছিল আমার কবিতা।

আমি বলি, 'মেজবু, মিঠুয়া তো চলে যাচ্ছে। বাড়িটা বড্ড ফাঁকা হয়ে যাবে। তুমি এসে থাকো না ওয়ারিতে কিছুদিন।'

মেজবু এক মুহূর্ত চিন্তা না করে, সময় না নিয়ে সরাসরি বলে, 'না। বড়বুর চোখের ওপর আমার থাকা হবে না।'

অনুতাপ হয় আমার। বড়বুর সমালোচনার কথাটা মেজবুকে একটু আগে না বললেও পারতাম। বোধ হয় আমার মনের অবস্থা মেজবু টের পায়।

'তুই আমাকে বলবি কি? আমি নিজেই কিছুদিন থেকে দেখছি। বড়বু কেমন চোখে আমাকে দ্যাখে, ঠিকই আমার চোখে পড়েছে। তাই ওয়ারিতে গিয়ে বেশিক্ষণ আর আজকাল থাকি না। থাকতে মন চায় না। মন খারাপ হয়ে যায়। বিধবার মতো যদি থাকতে পারতাম, সবাই খুশি হতো।'

আমি অনুভব করি, এ সবই সত্যি।

'তুই ব্যাটাছেলে তুই বুঝবি না। একেক সময় গাদা গাদা সেন্ট ঢালি গায়ে, হাত ভরে সোনার চুড়ি পরি, স্টুডিওতে গিয়ে ফটো তুলি খামোকা খামোকা। শান্তি পাই না।'

ফটোর কথায় মনে পড়ে যায় আমার।

'তাহলে সিনেমায় তুমি নামছ, এটা ঠিক শুনেছি? না, এটাও ওরা রটিয়েছে?'

মেজবু লজ্জিত হয়ে চিবুক নামায়। বিয়ের আগের মতো দেখায়। আমার খুব মায়া করে। সিনেমায় নামার ভারী শখ ছিল ওর। আমার সঙ্গেই ওর যত গল্প ছিল। আমার সাথেই ভাব। একাত্তরে শেষ কয়েকটা মাস তো ওয়ারির বাড়িতে আমরা ছোট ছোট দুটি ভাই বোন—সম্পূর্ণ একা।

মেজবু বলে, 'বিয়ের আগে তোর দুলাভাই তো কত বলেছিল চান্স করে দেবে, দেয়নি। ভাবল, বৌ যদি হাতছাড়া হয়ে যায়। সিনেমার নাম আর মুখেই আনে না। আমিও ভাবলাম, ঠিক আছে বাবা, সকলের কি আর সব কিছু হয়, আমি সংসারই করি। তারপর দেখি, সে নিজেই

আমাকে ফেলে আবুধাবি। আর তার ভয় নেই যে বৌকে কেউ নিয়েই গেল কি কিছু করল। টাকা এমনই জিনিস, টাকার লোভে সুন্দরী বৌ লোকে ফেলে যায়।'

আমি বলি, 'আর সেই সঙ্গে এটাও বোলো মেজবু, টাকার লোভে দেশটাকেও লোকে বেচে দেয়।'

'তুই থাক তোর পলিটিকস নিয়ে। এখনো শিক্ষা হয়নি।'

আমি অপ্রতিভ হয়ে বলি, 'আচ্ছা আচ্ছা, তুমি বলো।'

'বলব আর কি? তোর দুলাভাই গেছে আজ পাঁচ বছর ঘুরতে চলল। আমিও ঠিক করেছি, আমাকে নিয়ে তার যখন আর ভয় নেই, সিনেমায় নামলে এবার আপত্তি করবে না।'

'তখন তুমি মুসাভাইয়ের কাছে গেলে?'

'না।'

'তবে?'

'মুসাভাইয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। হুজুরের ওখানে।'

আমি হোঁচট খাই। এই চরিত্রটির কথা তো আগে কখনো শুনিনি।

'হুজুর? হুজুরটা কে?'

আমি জানি, হুজুরের চালান দেশে এখন বেশ উঠেছে। মেজবুও যে তার ভেতরে গিয়ে জুটেছে, জানা ছিল না।

নির্মল হেসে মেজবু বলে, 'আমার পীরসাহেব, মুরিদ হয়েছি যে। মুসাভাইও তার মুরিদ। সেখানে দেখা।'

আমি অবিশ্বাসের গলায় বলি, 'যাহ, কি বলো? মুসাভাই মুরিদ? যায় যায় যৌবনের পরিচালক আখতার মুসা হুজুরের মুরিদ?'

'মুরিদ মানে? বড় মুরিদ। সেদিন খরচা করে হুজুরের ওজুর জায়গাটা বাঁধিয়ে দিয়েছে। যায় যায় যৌবন হিট হয়েছে কেন? হুজুরকে দিয়ে ফিলমের রিল ছুঁইয়ে নিয়েছে। জবী, আখতার মুসা।'

আমি হাসি রাখতে পারি না। কৃত্রিম আবদেরে গলায় বলি, 'না, মেজবু, না। এ তুমি আমায় বিশ্বাস করতে বোলো না। ফিলিমের রিল ছুঁয়ে দিচ্ছে হুজুর কেবলা। না। মরে যাবো।'

হঠাৎ আমার সন্দেহ হয়। মেজবু আখতার মুসার যে খবর দিল, এতক্ষণে তার ভেতরে অন্য একটা সুর লক্ষ্য করি। অবিশ্বাসের সুর। বিদ্রূপের সুর। মেজবুর গলায়। হাসি মরে যায় আমার। মেজবুকে নতুন চোখে দেখতে থাকি।

বলি, 'ফিল্মের রিল ছুঁইয়ে নেয়া। তার মানে ব্যাপারটা তোমার কাছেও হাস্যকর মনে হয়েছে ?'

মেজবু কিছু বলে না। নির্বিকার মুখ।

'হুজুরে তোমার খুব ভক্তি, মেজবু ?'

মেজবুর চোখে যেন কৌতুকের ঈষৎ বিদ্যুৎ লক্ষ্য করি। সে কথা বলে না।

'আল্লাহর ওপর খুব তোমার বিশ্বাস ? ঘরে জায়নামাজ দেখছি। নামাজ বোধহয় পড়ছ আজকাল ?'

হ্যাঁ।'

'হুজুর তাহলে তোমার উপকারই করেছে, কি বলো ? তোমাকে একটা কাজ দিয়েছে। বিশ্বাস দিয়েছে। আশ্রয় দিয়েছে।'

মেজবু তেতো গলায় বলে, 'কি দিয়েছে জানি না, যাবার একটা জায়গা হয়েছে আমার। সেজে গুজে, শাড়ি গয়না পরে, সেন্ট মেখে, এখন আমি হুজুরের কাছে যাই। সেজে গুজে যখন বেরোই, তখন মনে হয় কত জায়গায় যাবো, কত মজা করব, কত ভালো লাগবে— তখন যে হুজুরের কাছে যাবো, একটুও ভাবি না। তারপর যেখানেই যাই, একদিকে নিজের লাগে খালি খালি, গায়ে করে জ্বালা, পুড়ে যায়, ফোসকা পড়ে যায় আরেকদিকে মানুষগুলো যে যেখানে পারে হাত দেয়, সুযোগ নিতে চায়। শেষ পর্যন্ত দেখি, হুজুরের খানকার দিকে রওয়ানা হয়েছি। কোনদিন হয়ত হুজুরের কাছে ঘনঘন যাওয়া নিয়েই লোকে বলবে।'

'বলতে পারে।'

'কাল মিঠুয়ার গায়ে হলুদে গেলাম। বড়বুর চাউনি ভালো লাগলো না। গা ঘিন ঘিন করে উঠল। তখন সোজা বেরিয়ে হুজুরের কাছে। তাই তুই বাসায় এসে আমাকে পাসনি।'

'আচ্ছা, বু, সব বুঝলাম। মুরিদ হয়েছে, তোমাকে সিনেমায় নামতে দেবে তো হুজুর ?'

'কেন দেবে না ?'

'সেকি ? সিনেমায় তুমি পার্ট করবে, পরপুরুষের সঙ্গে ওঠাবসা করবে, উনি অ্যালাউ করবেন ?'

'করবেন।'

'বলো কি ?'

'তোকে একদিন নিয়ে যাবো। তুই যা ভাবছিস তা নয়। মর্ডান পীর। আচ্ছা বাবা, অভিজ্ঞতার জান্যে তো একদিন যেতে পারিস ?'

আমার কৌতূহল হয়। মেজবু তার হতাশা আর যন্ত্রণা আর ব্যার্থতার চিকিৎসার জন্যে এই মলমটির সন্ধান পেল কি করে ?

শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে বসি, হুজুরটিকে পেলে কোথায়, মেজবু ?'

'কোথায় মানে ?'

'মানে, কে তোমাকে সন্ধান দিল ?'

'মিঠু।'

আমি বিস্ময়ে ছিটকে পড়ি।

'কে ?'

'মিঠু। আমাদের মিঠুয়া।'

'মিঠু হুজুরের মুরিদ ? কই জানি না তো। কখনো শুনিনি তো।'

আমি জানি, আমি ভালো করেই জানি, আমাদের এই নষ্ট সময়ের একটা ব্যাপারই হচ্ছে—অবাক হতে নেই, কেবল দেখে যাও। তবু তারো একটা সীমা আছে, শেষ আছে, চূড়ান্ত আছে।

মেজবু পুরো ব্যাপারটা বানিয়ে বলেছে না তো ? সেই রকমই অসম্ভব শোনাচ্ছে।

'না, মিঠু মুরিদ কেন হতে যাবে ?' মেজবু বলে, মনসুর সায়েব মুরিদ। অবশ্য তিনি খুব বেশী যান না হুজুরের ওখানে। যেতে পারেন না। ব্যস্ত তো। হুজুরকে দাওয়াত করে নিয়ে যান বাড়িতে।

"এবং বড়লোক মুরিদ, হুজুরের সময়ের অভাব হয় না।'

'ওরকম করে বলিস না। যে কারণেই মুরিদ হই, তিনি আমার হুজুর।'

'তা বুঝলাম। কিন্তু মনসুর সায়েবকে যে রকম আপনি টাপনি করে উল্লেখ করলে আর তার ব্যস্ততার কথা বললে, মনে হয় অনেক দিনের পরিচয় তোমার সঙ্গে। আমি কিন্তু জানতাম না।'

মেজবু ইতস্ততঃ করে। আমি এক দৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করে চলি। সান গ্লাসের এই এক সুবিধে। মেজবু টের পায় না, যে আমি তার চেহারায় দেখতে পাই কথা চুরি করবার চেষ্টা। এ বিষয়ে মেজবু কিছু বলে না। আমিও আর খোঁচাতে চাই না। যেখানেই হাত দিচ্ছি,

হাত পুড়ছে।

উঠে দাঁড়াই আমি। বলি, 'যাহোক, বিয়েতে আসছ তো ?'

'হ্যাঁ, বলিস কি তুই ? আসব না মানে ?'

হঠাৎ মেঘ ফেটে রোদ যেন দেখা দেয়, আমার একটা কথা মনে হয়। মিঠুয়া বোধহয় তার মেজখালাকে মনের কথা বলেছিল। বোধহয় মনসুর সায়েবের সঙ্গে খালাকে নিয়ে সে বাইরে ঘুরেছে টুরেছে, খাওয়া দাওয়া করেছে প্রথম দিকে। অসম্ভব নয়, মনসুর সায়েবকে একদিন হয়ত মেজবুরই ভালো লেগে গেছে। সে তো আর ভাবতে পারেনি মিঠুয়া বিয়ে পর্যন্ত এগোবে মনসুর সায়েবের সঙ্গে। মেজবু হয়ত তার নিজের ভাল লাগাটাকে বাড়তে দিয়েছিল মনের মধ্যে। তারপর ভাগনি তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেও মনের ওপর গোলাপি পোঁচটা রয়েই গেছে তার।

মনের মধ্যে চমৎকার এই গল্পটি বানিয়ে আমি নিজেই খুশি হয়ে যাই। খুশি হয়ে যাই নিজের ক্ষমতা দেখে। গল্প লিখলেও খারাপ করতাম না।

'হাসছিস যে ?' মেজবু মৃদু ধমক দিয়ে উঠে।

'না এমনি।'

'টাকাটা কি সত্যি তোর দরকার ?'

'কোন টাকা ?'

'ঐ যে চাইলি। ন্যাকামি হচ্ছে ? টাকা দিয়ে কি করবি ?'

আমার মনে পড়ে যায়। মেজবুর মন পরীক্ষা করবার জন্যে টাকা চেয়েছিলাম আমি এসেই। এখন কথাটা আর ফেরত নিই না। বলি, 'মিঠুকে এটা কিছু কিনে দিতাম। আমি এখনো স্টুডেন্ট, ডিপেন্ডেন্ট, তবু আশা করে তো ?'

'করেই তো। চল, না হয় দুই ভাই বোনে বেরোই। আমারও তো একটা কিছু দিতে হবে। কি দেব ? ওরা যা বড়লোক। সবই আছে।'

বাড়ি ফেরার জন্যে ছটফট করি। মনসুর সায়েব এসেছিল কেন, জানা দরকার। আজ বাদে কাল বিয়ে, আদব কায়দা মানা বিয়ে; এ বিয়ের বর বিয়ের আগের দিন স্বয়ং এসে কনে বাড়িতে হাজির হবে— এ একেবারে চূড়ান্ত বেয়াদবি।

কথাটা মেজবুকে বলব, ? না, থাক। মনসুর সায়েবের সঙ্গে মেজবুর কতদিনের পরিচয়, কেন মনসুর সায়েবের উল্লেখ

করতে গিয়ে মেজবু এতটা বিনীত, এ সব না জেনে মুখ খোলা ঠিক হবে না।

মুখে বলি, 'বেরুতে হলে এক্ষুনি। দেরী করো না। বিয়ে বাড়ি। মেলা কাজ আছে।'

'জানি। দু'মিনিট।'

শাড়ি তোয়ালে, নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যায় মেজবু। পেছন থেকে আমি বলি, 'বেশি সাজগোজ না কিন্তু। বড়বু একদম খচে আছে।'

১২

দু' ভাই বোনে বাড়ি ফিরি। বাড়ি মানে আমাদের বাড়ি। ওয়ারির বাড়ি। মেজবু আর আমি মৌচাক বায়তুল মোকাররম চষে ফেলেছি। মিঠুয়ার জন্যে মেজবু কিনেছে নবরত্ন বসানো চৌকো লকেট আর চেন। সে অনেক টাকা। মিডল ইস্টের ওরাই পারে। আমি কাগজের তৈরি বাঘ-মুখোশ। মেজবু এত করে বলল টাকা নিতে, মিঠুয়ার জন্যে দামী কিছু কিনতে। দেখি, বায়তুল মোকাররমের চত্বরে এক বেহারী নানা রকম মুখোশ বিক্রি করছে। দেখেই আইডিয়াটা মাথায় এলো। দু'টাকা মাত্র দাম। আমার সাধ্যের মধ্যে। চমৎকার। মিঠুয়াকে দিয়ে বলব, হার মানবি না। বাঘিনী হওয়া চাই। মুখোশটা তার পয়লা পাঠ।

মেজবু হেসে খুন। বলে, 'এ কিন্তু তোর অসভ্যতা হচ্ছে। মিঠুয়ার বয়স হয়েছে। মাইন্ড করবে।'

আমি গম্ভীর গলায় বলি, 'নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারছ না? এ সমাজে বাঘিনী না হলে মেয়েদের বাঁচন নেই। আমি চাই না মিঠু শেষে মুরিদ হোক।'

মেজবু গম্ভীর হয়ে যায়। সারা রাস্তা সেই গম্ভীর তো গম্ভীর। আমি আর ঘাঁটাই না।

বাড়ি ঢুকেই তুলকালাম কান্ড।

মেজভাই আমাকে দেখেই চিৎকার করে ওঠে, 'এসেছিস? এতো-ক্ষণে? শুয়ার। আমাকে সামনে ছেড়ে দিয়ে কাটা হয়েছিল? আয় ইদিকে।'

আরে, আরে, ব্যাপারটা কি ?

মেজভাই রীতিমতো আমাকে ধাওয়া করে। যেন আমি বাচ্চা ছেলে। বাড়িতে মেহমান আছে। তরুণী। আমার প্রেস্টিজ পাংচার করবে দেখি।

আমি ধমকে উঠি, 'আহ, কি হচ্ছে ? থামো তো থামো।'

যেন আমার জানবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, আমি দুমদুম করে ওপরে উঠে যাই। মেজবু হতভম্ব হয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওপরে উঠে দেখি আবহাওয়া সম্পূর্ণ বিপরীত। নিচে যদি ঝড় তো ওপর তলায় গভীর প্রশান্তি। মিঠুয়া শীতল পাটির ওপর গা হাত পা ছেড়ে অঘোরে ঘুমিয়ে আছে। রেলিংয়ের পাশে চেয়ার টেনে, হাঁটুর ওপর থুতনি নামিয়ে গুনগুন করছে সুরাইয়া। আমাকে দেখে ফিরেও তাকায় না। ছবিটাই অস্বাভাবিক ঠেকে। বড়বুর ঘরে উঁকি দিই। ঘরে নেই।

তখন আমি হাঁক দিই, 'বড়বু। বড় বুউ-উ।'

সাড়া পাই না। বড়বুকে কখনোই আমার এক ডাকের বেশি দিতে হয় না। আজ ভারী আশ্চর্য তো। তবে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাই। ফিরে দেখি, বড়বু নয়, মেজভাই। হনহন করে উঠে আসছে। আমার মোকাবেল হতেই হাত তুলে নীরবে খানিকক্ষণ নাচায়। বেশ বুঝতে পারি, এত রেগে গেছে যে কথা বেরুচ্ছে না।

একটু পরেই অবশ্য সরব হয়ে যায় সে। বলে, 'কত বড় সাহস। কত্ত বড় সাহস। আমার বাড়িতে চড়াও হয়ে আমাকে চোর বলে যায় ?'

অর্থাৎ মনসুর সায়েবের কথা হচ্ছে। আমি আজ তখন থেকেই জানি, একটা ঝামেলা আছে।

মেজভাইকে থামিয়ে দেয় সুরাইয়া। ছুটে এসে বলে, 'প্লিজ, আপনারা নিচে যান। ও ঘুমোচ্ছে।'

'ঘুমোচ্ছে মানে কি ? ঘুম ওর বার করছি।' মেজভাই তেড়ে এগিয়ে যায় মিঠুয়ার ঘরের দিকে।

আমিই এবার মেজভাইকে টেনে ধরি, বাধা দিই।

'নিচে চলো তো। মাথা ঠান্ডা করে আমাকে বলবে তো কি হয়েছে ?'

মেজভাই আমার ওপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

'তোর পাছার চামড়া আজ আমি তুলব।'

'আহ, নিচে, নিচে।' আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারি না মেজ-ভাইকে।

সুরাইয়া তখন বড় হিসেব করা ঠান্ডা গলায় উচ্চারণ করে, 'দেখুন অনেক কষ্টে ঘুমের ওষুধ আনিয়ে মিঠুয়াকে ঘুম পাড়িয়েছি। এই ঘুম যদি আপনাদের চেঁচামেচিতে—তাহলে বুঝবেন।'

নাহ, স্বীকার করতেই হবে। মেয়েটির গুণ আছে। মেজভাই আর একটিও কথা না বলে নেমে যায়। সুরাইয়ার দিকে আমি তাকাই। ইচ্ছেটা এই যে বিবরণটা তার কাছ থেকেই সংগ্রহ করি। কিন্তু কালকের সেই সিগারেট ফোঁকা, প্রেম নিয়ে আদিখ্যেতা করা মেয়েটিকে আমি আর খুঁজে পাই না। নীরবে সে আমাকে দেখতে থাকে। ওটাই অনুবাদ করে নিই। আমিও অচিরে মেজভাইয়ের পথ অনুসরণ করি।

'কি হয়েছিল কি, আমাকে বলো ত ? তোমাকে চোর বলেছে মানে ?'

মেজভাইও তেমনি। আসল কথায় সহজে আসে না।

উলটে আমাকে জিগ্যেস করে, 'তুই জানতিস, মনসুর এসেছে। বাইরে বেরিয়ে দেখেছিস, সে এসেছে। বল ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপরও তুই নিজে তাকে ডিল না করে আমার ঘাড়ে ফেলে চলে গেলি ?'

'আমি কি জানি সে কেন এসেছে ?'

'তোকে বলেনি সে ? এই যে আমাকে বলল, তোকেই সে প্রথম জিজ্ঞেস করেছিল।'

'হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করেছিল। একটা লোকের কথা। সে লোকের সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি। তোমার হয়েছে। আর তুমি এখন এত ধানাই পানাই না করে বলবে কি হয়েছে ?'

এর মধ্যে মেজবু বাথরুমের দিক থেকে চিৎকার দিয়ে ওঠে।

'বড়বু নাইরে, বড়বু নাই।'

নাই মানে ? মরে গেছে ?

মেজভাইও চমকে ওঠে। বোধহয় অনেকক্ষণ বড়বুর খোঁজ কেউ নেয়নি। কখন সে বাথরুম মরে পড়ে আছে। এতো আরেক অ্যামবুশ হয়ে গেল দেখছি।

বাথরুমের মেঝেতে পড়ে আছে বড়বু। শাড়ি টাড়ি পানিতে ভিজে

সপসপ করছে। দু'ভাই আমরা তাড়াতাড়ি টেনে বারান্দায় এনে শুইয়ে দিই। ওপর থেকে সুরাইয়া নিঃশব্দে নেমে আসে।

আমি নিজেই টের পাই, আমার গলাটা কেমন অন্য মানুষের শোনাচ্ছে। তবু আমি ডাক ছেড়ে ডাক দিই, 'বড়বু' বড়বু।'

মেজভাই আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। বুকে কান পাতে। মুখে হাত রাখে। তারপর উঠে বসে বলে, 'ফিট হয়েছে। পানি আন। রাফিয়া, দুধ গরম কর।'

সুরাইয়া নীরবে আমাদের কাজ কর্ম সেবা শুশ্রূষা কিছুক্ষণ দেখে ওপরে চলে যায়। ওপরে রেলিংয়ের পাশে আবার চেয়ারে গিয়ে বসে। সেখান থেকে আমাদের সে দেখতে থাকে। বড় অস্বস্তি লাগে। গ্যালারির দর্শকের মতো সুরাইয়াকে মনে হয়। তার এই হাবভাব, তার এই নীরবতা আমার ভালো লাগে না। অন্য এক সুরাইয়া। অন্য শিবিরের মনে হয়।

বড়বুকে ঘরে নিয়ে যায় মেজবু। তখন আমি বিস্তারিত সব শুনি মেজভাইয়ের কাছে।

মনসুর সায়েব মেজভাইকে জিজ্ঞেস করে, কাল যে লোকটাকে সে টাকা দিয়ে পাঠিয়েছিল সে কত টাকা দিয়েছে। মেজভাই একটু অবাক হয় প্রশ্নটা শুনে। একটু অপ্রস্তুতও হয়। তবু উত্তর দেয়। কারণ, তার মনে হয় টাকা নিয়ে কোথাও নিশ্চই কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।

'আপনাকে ষোলো হাজার দিয়েছে? ষোলো হাজার?'

মেজভাই আশ্বস্ত করে, 'আমি নিজে গুনে নিয়েছি। ষোলো হাজার।'

'কিন্তু আমি যে পাঠিয়েছি পঁচিশ হাজার।'

প্রথমে মেজভাই বেশ বিচলিত হয়ে পড়ে মনসুর সায়েবের জন্যেই। যে লোকটির মারফত টাকা পাঠিয়েছিল সে মেরে দিয়েছে ন'হাজার টাকা। মেজভাই জানতেও চায় যে লোকটি এখন কোথায়।

মনসুর সে কথা খুলে বলে না। বারবার সে বিস্ময়ের সঙ্গে উচ্চারণ করতে থাকে, 'ষোলো হাজার? আপনি বলছেন ষোলো হাজার? গুনে দেখেছেন ষোলো হাজার?'

তখন ধীরে একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দেয় মেজভাইয়ের মনে।

'হঠাৎ আমার মনে হয়, বুঝলি সানো, মনসুর তো আমাকেই সন্দেহ

করছে। আমি পঁচিশ হাজার পেয়ে ষোলো হাজার বলছি, ন'টি হাজার মেরে দিয়েছি, এই রকম ভাবছে। আমার মাথায় বাজ পড়ে যায়। তোরা তো জানিস, আমি চটে গেলে কেমন। আমার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। টাকার অভাব আমার আছে, কিন্তু তাই বলে ভাগনি জামাইয়ের টাকা মেরে দেব, এমন চামার আমি নই।'

আমি জানতে চাই, 'বললে না তুমি, ডাকো সেই লোকটাকে, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করো, সামনা সামনি হয়ে যাক সে কত টাকা দিয়েছে।'

'সেই কথাটাই শক্ত করে বলেছিলাম। তার জবাবে হারামীর বাচ্চা আমাকে বলে, সে লোক মিছে কথা বলার লোক নয়।–লোক নয় তো তুই এই ভোরবেলায় টাকার খোঁজ নিতে এসেছিস কেন ? নিশ্চয়ই তোর কিছুতে সন্দেহ হয়েছে।'

'কি বলল ?'

'কত বড় স্পর্ধা, তার ওপরে আমাকে প্রশ্ন করে, মোহরখানা পেয়েছেন তো ? নাকি তাও পাননি। তখন আমার আর জ্ঞানট্যান কিছু থাকে না। ঐ মেয়ে ছিল।' রেলিংয়ে বসা সুরাইয়াকে দেখিয়ে মেজভাই বলে, 'আমি ওকে দেখিয়ে দিয়ে বলি, ওকে জিজ্ঞেস কর, ও পেয়েছে, ও নিয়েছে, আমি জানি না।'

সুরাইয়া রেলিং থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে বলে, 'আপনি এখনো কিন্তু আমাকে চোর ধরছেন। ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।'

এতক্ষণে আমি বুঝতে পারি সুরাইয়ার চেহারা আর চালচলন এক বেলার ভেতরে বদলেছে কি কারণে।

মেজভাইকে টেনে আমি ঘরের ভেতর নিয়ে যাই। সুরাইয়ার চোখের লাইন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই।

'তুমি তো এক কান্ড বাধিয়েছ দেখছি।'

'কান্ড আমি বাধালাম ? বাড়ি বয়ে আমাকে এসে চোর প্রমাণ করা ? মোহর পেয়ে স্বীকার হচ্ছি না ? ন'হাজার টাকা গাপ করে দিয়েছি ? শালা ছোটলোকের বাচ্চা, বাংলাদেশ হওয়ার পর বড়লোক হয়েছে, ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা লোন নিয়ে শোধ দেবার নাম নেই, ভোগ করছ, বেকায়দা দেখলেই মন্ত্রী মহলে দানা ছড়িয়ে দিচ্ছ, আর আমাকে এসে চোর বলছ, শালা চোরের বাচ্চা চোর। হাতে আমি পাবো না আবার বন্দুক ? সময় আবার আসবে না ?'

আমি বুঝতে পারি, মেজভাই কখন সত্যি বলছে আর কখন মিথ্যে

বলছে। আমি এখন হলপ করে বলতে পারি, মেজভাই ষোলো হাজার টাকাই পেয়েছে, পঁচিশ হাজার নয়। আর, মোহর যেই নিয়ে থাক, মেজ ভাই কক্ষণো নয়।

আপনাদের হয়ত মনে পড়বে, কাল রাতে এই মোহর নিয়ে আমি একবার মেজভাইকে সন্দেহ করেছিলাম। এখন সে কথা মনে হয়ে আমার রাগ হয়। আমার নিজের ওপরে রাগ হবার কথা। রাগ হয় মনসুরের ওপর। এতবড় সাহস বাড়ি এসে অপমান করে যায় ?

কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়।

মেজভাইকে আমি জিজ্ঞেস করি, 'আমি ভেবে পাচ্ছি না, মনসুর সায়েব কেন জিজ্ঞেস করতে এলো, টাকা ঠিক মতো তুমি পেয়েছ কি না। আর তোমাকেই বা সন্দেহ করে বসল কেন ? সন্দেহ করলেও এ ভাবে কেউ বলে ? আমার তো অদ্ভুত লাগছে।'

'আমিও তখন থেকে গুম হয়ে ভাবছি, ব্যাপারটা কি ?'

আমি অপেক্ষা করি। মেজভাই মনের ভেতরে কি একটা কথা নাড়া-চাড়া করছে টের পাই।

'আমার কি অনুমান জানিস ?'

আমি কান খাড়া করি।

'অনুমান কেন ? আমি তো হান্ড্রেড পারসেন্ট স্যাংগুইন। ও চায় না আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকুক। বয়স হলে বাচ্চা মেয়ের ওপর লোভ হয়। মিঠুয়া জোর করেছে, নিয়ম মতো বিয়ে হতে হবে, চাপ দিয়েছে। আসলে বোধ হয় ইচ্ছে ছিল, বিয়ে না করেই, বুঝলি না—বাধ্য হয়েছে এখন। তাই প্যাঁচ ঝেড়েছে, যাতে মিঠুয়াকে আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলতে পারে।'

আমার কাছে খুব সম্ভব বলেই মনে হয় মেজভাইয়ের এই অনুমান।

মেজভাই বলে, 'ছোটলোক তো ? টাকা হলেই মানুষ মানুষ হয় না। শালা বুদ্ধি করেছে, টাকার গোলমাল রটিয়ে, মোহর চুরির অপবাদ দিয়ে আমাদের খাটো করবে। জানে না, আমার মায়ের গলার মোহরের হার তিন পুরুষের। এখনো আছে। পেচছাপ করি তোর মোহরের ওপর। আমি পেচছাপ করি।

'আ, হয়েছে, হয়েছে।' আমি থামাতে চেষ্টা করি মেজভাইকে। আমার কৌতুহল হয়, লোকটা বিদায় নিল কি ভাবে।

'তাড়িয়ে দিলাম।'

'মানে, কি ভাবে বললে ?'

'কিভাবে আবার ? যে ভাবে বলে। আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ কখনো রাখ ঢাক করে কথা বলেনি। বাবার তো প্রমোশনই হলো না স্ট্রেট ফরোয়ার্ড কথা বলার জন্যে। নইলে প্রভিনসিয়াল সেক্রেটারি হয়ে রিটায়ার করার কথা। এ সব হিস্ট্রি জেনে রাখবি।'

'তাহলে তুমি তাড়িয়ে দিলে ?'

'হ্যাঁ, বললাম, যা পারো করোগে, যাও।'

'এহ, এ তুমি কি করেছ ?' আমি চমকে উঠে বলি।

'কেন ?'

'তার মানে তো তুমি স্বীকারই করে নিলে যে, টাকা তুমি মেরে দিয়েছ, যা পারে সে এখন করুকগে।'

গুম হয়ে যায় মেজভাই।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'মিঠুয়া ? সে কোথায় ছিল ? তোমরা কোথায় কথা বলছিলে ?'

'সে লোক ভেতরে আসবে না। আমিও ভেতরে আসতে বলিনি। রাস্তায়। কথা হচ্ছিল রাস্তায়।'

মেজ ভাইয়ের গলা মিয়োনো এখন। আমার কথা শুনে দমে গেছে।

'মিঠুয়া তাহলে শোনেনি ?'

'শুনেছে। আমি ভেতরে এসে চেল্লাচেল্লি করেছি বড়বুর সঙ্গে। তখন ওপর থেকে শুনেছে। শুনে সে আরেক কান্ড! ঐ মেয়ে ওষুধ এনে জোর করে খাইয়ে, তবে শান্ত হয়। এ যে কি এক কান্ড করল মিঠুয়া।'

মেজভাই দু'হাতে মাথার রগ টিপে বসে থাকে।

পেছনে পায়ের শব্দ পাই। সুরাইয়া নিচে নেমে এসেছে। আমি তাকে দেখে গলা টলা পরিস্কার করে স্বাভাবিকতার আবহাওয়া তৈরি করি। সেই আওয়াজে চোখ খোলে মেজভাই। সুরাইয়াকে দেখতে পায়।

হঠাৎ ফেটে পড়ে মেজভাই। সুরাইয়াকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে ওঠে।

'হ্যাঁ, আমি বলেই তো দিয়েছি। এ বাড়িতে বিয়ে হবে না। আমি হতে দেব না। আমি থাকতে হতে পারবে না।'

বাজিয়ে বাজিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করে মেজভাই। এবং বুঝতে পারি, এই প্রথম নয়, আমার অনুপস্থিতকালে এই সিদ্ধান্ত মেজভাই আগেও ঘোষণা করেছে সুরাইয়ার কাছে।

মেজবুর যখন বিয়ের কথা ওঠে বেলায়েত দুলাভাইদের সঙ্গে, তখন মেজভাই চেচামিচি করে বলেছিল, 'বাড়িতে বিয়ে হবে না' সেটা ছিল কৌশল। হাতে ছিল না টাকা। নিখরচায় তো আর বিয়ে হয় না। মেজভাই নকল রাগঝাল করে দায়িত্ব এড়িয়ে ছিল সে বার। আর আজ সত্যি সত্যি রাগ করেছে সে। আমার মনে একটুকু সন্দেহ নেই যে, মেজভাইয়ের লাশ পড়ে যাবে, তবু এ বাড়িতে মিঠুয়ার এ বিয়ে সে হতে দেবে না।

সুরাইয়া ঠান্ডা চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে মেজভাইয়ের দিকে। তারপর বলে, 'এই বাড়িতেই বিয়ে হবে। দেখি না হয় কি করে।'

বলেই শরীরে এক ঠেলা দিয়ে যেনবা উড়ে যায় সুরাইয়া। আমাদের দরোজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমাদের এই পাড়া ছেড়ে কোথায় যেন চলে যায়।

আমি মিঠুর ঘরে যাই। ঘুমিয়ে আছে। আর সুন্দর লাগছে না। কাঁচা হলুদে মুখখানা জন্ডিসের রোগীর মতো দেখাচ্ছে। যেন হাসপাতালের বেডে। বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে আমার। মিঠুয়ার কপালে হাত রেখে বিছানার পরে বসি।

তখন হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল কি ফেলে দিয়েছিলাম বাঘের মুখোশখানা। মনে নেই। যে ঝামেলার মধ্যে ছিলাম। এখন দেখি, বেড়ালটা সেই মুখোশের অদূরে রোঁয়া ফুলিয়ে বসে আছে। তাক করে আছে। যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়ে আছে।

'মিঠু।' আমি ডাক দিই। 'মিঠুয়া। মিঠুরে।'

আমার ভাবনা হয়। সুরাইয়া গেল কোথায়? মিঠুয়াকে সঙ্গ দেবে বলে এসেছে, তাকে ফেলে রেখে চলে গেল? আমার ভালো লাগে না। মেজভাইকে ওভাবে শাসিয়ে যেতে পারল মেয়েটা? আমাদের বাড়ি, আমাদের ভাগনি, আমাদের ব্যাপার, সুরাইয়া কোথাকার কে? যে, বুক ঠুকে বলবে, বিয়ে এ বাড়িতেই হবে?

দুপুর গড়িয়ে যায়। সুরাইয়া ফেরে না। একটু আগে মিঠুয়া জেগেছে। জেগে উঠে নিঃশব্দে সে মায়ের ঘরে গেছে। সোজা মায়ের

কোলে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে। মায়ে মেয়েতে কোনো কথা নেই। আমাদেরই মনে হয়, নীরবে এখান থেকে সরে যাওয়া ভালো।

মেজবু বলে, 'সানো, আমার সঙ্গে চল না ?'

'কোথায় ?'

'বাহ, আমার কিছুই আনা হয়নি যে। কাল বিয়ে। পরব কি ?'

তাও তো বটে। কিন্তু আমার অবাক লাগে, আমি যেখানে কিছুই স্থির বলে মনে করতে পারছি না, মেজবুর ভাবখানা—কিছু হয়নি, সব ঠিক আছে।

'আমার বোধহয় বাড়িতে থাকা দরকার।' আমি অর্থপূর্ণভাবে মেজ ভাই এবং বড়বুর ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলি।

'বাদ দে তো।' মেজবু আমার হাত ধরে টানে। গলা নামিয়ে বলে, 'কিছু গয়না আনব পরার জন্যে। সঙ্গে একজন না থাকলে সাহস হয় না। চল তো চল।'

১৩

বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আমার বুকের ভেতরে ঢিবঢিব করে। এ আবার কি? এরকম তো আমার কখনো হয় না। রিকশ নিয়ে আমি আর মেজবু চলেছি রামপুরার দিকে। একটা স্কুটার দেখে লাফ দিয়ে নেমে দাঁড় করাই।

'আবার স্কুটার কেন?'

'তাড়াতাড়ি হবে।'

মনে মনে ছকে রাখি, এই স্কুটারই দাঁড় করিয়ে রাখব, এতেই ফিরে আসব। কিন্তু তা হয় না। মেজবু আমাকে ধমকে দেয়। তার নাকি একটু দেরী হবে। আমি ঘরে না বসে রাস্তায় এসে দাঁড়াই।

নিঃশব্দে সুলতান মোহাম্মদ উদিত হয়।

'দাঁড়িয়ে আছেন? ভেতরে যাননি?'

তার সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি আমার নেই। কিন্তু আমার নিজের এখন অনেক ঝামেলা। এই লোকটাকে নিয়ে পড়তে চাই না। মেজভাই তো আমাকে মনে করিয়েই দিয়েছে আমাদের ফ্যামিলি ট্রাডিশন। মুখের ওপর কথা বলি আমরা। স্ট্রেট ফরোয়ার্ড।

'কেন বিরক্ত করছেন? আপনার সঙ্গে আমার ডায়লগ নেই।'

হকচকিয়ে যায় লোকটা।

'অ্যাঁ? মানে? না।' একবার হাসতে, একবার কঠিন হতে চেষ্টা করে সে। মাঝখান থেকে কোনোটাই পারে না। শেষে বলে, 'আচ্ছা, আমি ভেতরে খবর দিই আপনি এসেছেন।'

আমি কিছু করি না। কেবল তার হাতটা খপ করে ধরি। খুব আস্তে করে বলি, 'খবরদার।'

তাতেই বুঝে যায় লোকটা। মানে মানে পিছিয়ে যায়। হাওয়া হয়ে যায়।

প্রায় আধ ঘন্টা পরে মেজবু চেহারা দেখায়।

আমি না বলে পারি না, 'তোমাদের অভ্যেস যাবে না, বুঝলে? বাড়িতে তুফান চলছে। তুমি এখানে সেজেগুজে বিউটি বক্স হাতে নিয়ে বেরুলে! এখন দুপুর বেলায় স্কুটার পেতে আধাঘন্টা।'

ওয়ারিতে ফিরে আসি আমরা। ফেরার পথে আবার চিবচিব আমার বুকের ভেতরে। আমি বুঝি না। আমার কেমন যেন পিপাসা পায়। হুড়মুড় করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ি। পেছন থেকে মেজবু চেল্লায়।

'বক্সটা আমার নিয়ে যা, বাবা। স্কুটারকে ভাড়া দিই।'

গয়নার চিন্তায় গেল মেজবু। যেন কেউ এক্ষুণি কেঁড়ে নেবে। এদিকে আমরা মরছি মিঠুয়া-মনসুর-সুরাইয়ার ঝামেলায়। একজন দোজবরে বুড়ো বিয়ে করেছেন একজন এসে মামা শ্বশুরকে চোর সাব্যস্ত করছেন, আরেকজন বাইরের লোক হয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে মেজবুর গয়নার হিসেব ঠিক আছে।

যার মাল সে সামলাক।

বাড়ির ভেতরে দেখি সব চুপচাপ। মেজভাই বারান্দায় পায়চারী করছে। নিঃশব্দে। কিন্তু যেন বোমা। টোকা দিলেই বাস্ট করবে। ওপরে বড়বু। এখন বসে। মূর্তির মতো। আমার পায়ের শব্দে এতটুকু নড়ে না, ফেরে না। মেয়েটা গেল কোথায়? এই তো মায়ের কাছে শুয়ে ছিল, রেখে গেলাম। উঁকি দিয়ে দেখি, মিঠু তার ঘরে। চুপচাপ। তবে নিজেকে দেখছে। আয়নায়।

মেজবু ওপরে উঠে এলে ওকে আমার ঘরে টেনে নিই। খুব নিচু গলায় বলি, 'এখন আর হৈ চৈ করে দরকার নেই। চলো, নিচে আমরা রান্নার জোগাড় করি। তে মাকেই আজ রাঁধতে হবে, বুঝতেই পার।'

রান্না ঘরে আমি বসে থাকি মেজবুকে সঙ্গ দিই। আমাদের সঙ্গে কেউ কথা বলে না। আমরাও কারো সঙ্গে কথা বলি না। মেজভাই ঘরের ভেতরে চলে যায়। আর বাইরে আসে না।

অনেকক্ষণ পরে সদর দরোজায় কেউ ধাক্কা দেয়। ভাতের ফ্যান গালছি আমি তখন। মেজবু হাঁড়িটা ধরিয়ে দিয়েছে। হাত জোড়া। ফ্যান পড়ছে এখনো। সময় নেবে। ততক্ষণে দেখি মেজভাই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। দেখি, সদর দরোজার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। কিন্তু এগোচ্ছে না। খুলছে না।

মেজবু আমার দিকে তাকায়, উঠে যায়, দরোজার খিল খুলে দেয়।

সুরাইয়া পা রাখে ভেতরে।

হাঁড়ি রেখে আমি উঠে দাঁড়াই।

সুরাইয়ার পেছন পেছন পাঁচটি মেয়ে ঢোকে। মেজভাই বারান্দা থেকে নেমে আসে উঠোনে। সুরাইয়া তাকে যেন দেখতেই পায় না। হনহন করে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। মেয়েগুলো তাকে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে অনুসরণ করে। অচিরে ওরা সিঁড়ির ওপর। তারপর বাঁক নিয়ে দোতলায়।

আমি মেজভাই মেজবু, তিনজনই হা করে দেখছি এই কুচকাওয়াজ। হঠাৎ আমারই প্রথম চোখে পড়ে। সদরের খোলা দরোজায় তিনজন যুবক। একজন ভেতরে। একজন দরোজার ওপরে। আরেকজন রাস্তায়।

ভেতরের জন আওয়াজ দেয় দোতলার দিকে তাকিয়ে। সুরাইয়া সেখানে দেখা দেয়। সে ভারী বিরক্ত হয় যুবকের দিকে তাকিয়ে। সে আমাদের কাউকে গ্রাহ্যই করে না। সে যুবকটিকে বলে, 'পাইছস কি? খাড়ায়া থাকনের লাইগা ধুমা দিছি?'

আমার বুকের ভেতরে আবার ঢিবঢিব করে। মানেটা এবার বুঝতে পারি। এক ধরণের শৃংখলা তখন ফিরে আসে আমার ভেতরে। সম্ভবত মেজ ভাইয়ের ভেতরটার খবরও এখন আমারই মতো।

মেজভাইয়ের হাত দু'টো দেহের দু'পাশে; আর টান টান নয় কেমন শিথিলভাবে ঝুলে আছে। আমাদের দু'ভাই থেকে আলাদা হয়ে যায় মেজবু। সে চট করে কি একটা সিদ্ধান্ত নেয়। দৌড়ে উঠে যায় দোতলায়। বড়বু কিম্বা মিঠুয়ার কাছে সে যায়। আমার জানতে কৌতুহল হয়, সে কার কাছে যায়।

অবিলম্বে ওপর থেকে খিলখিল হাসি ভেসে আসে। প্রথমে একজন দু'জন, তারপরে অনেকে। রঙগীন কাগজ কুচির মতো উঠোনে ঝরে পড়তে থাকে শব্দগুলো। মিঠুয়াও কি হাসছে? মিঠুয়া যদি ওদের

সঙ্গে যোগ দিয়ে থাকে হাসিতে। আমি অবাক হবো ? অথবা, হবো না ?

জীবনে কত কিছুই তো জানা হয় নি। জানি না। জানব না। মিঠুয়ার এই ব্যাপারটাও না হয় নাই জানলাম। হাসির এই ঝর্ণা ধারায় সে আছে কি না।

বাইরে কয়েকটা মোটর সাইকেলের আওয়াজ শোনা যায়। ঘিইইস ঘিইইস করে চারটি মোটর সাইকেল আমাদের দরোজা পেরিয়ে যায়, আবার ঘিরে আসে, পাক খায়।

মেজভাই বিস্ফারিত চোখে সেই থেকে তাকিয়ে আছে তো আছেই। একজন যুবক তার কাছে আসে। সে একগাল হেসে প্রশ্ন করে, 'পেশাবের জায়গাটা কই, মামু ?'

দরোজা দিয়ে মোটর সাইকেল বাহিত সাত আটটি যুবক এসে ঢোকে। তারা উঠোনময় হাটতে থাকে। তারা চারদিকে চোখ চালায়, ওপরে দেখতে দেখতে হাঁটে, একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে হুটো-পাটি করে। সুরাইয়া দোতলার বারান্দায় এসে হাত বাড়ায়, নিচ থেকে একজন সিগারেটের প্যাকেট ছুঁড়ে দেয় তাকে, চমৎকার ক্যাচ ধরে সে চলে যায়। আমার ঘরে টু-ইন-ওয়ান ফুল ভলুমে বেজে ওঠে হঠাৎ। পৃথিবী আমারে চায় রেখো না বেধে আমায়। নিচ থেকে যুবকেরা হো হো করে হেসে ওঠে। ওপর থেকে মেয়েরা সব বারান্দায় ছুটে এসে রেলিংয়ে পেট চেপে ভাঁজ হয়ে হেসে ভেংগে পড়ে। ওপর নিচ সয়লাব হয়ে যায় অট্টহাসিতে।

আমি ছুটে দোতলায় গিয়ে একটি মেয়ের কোল থেকে টু-ইন-ওয়ানটা কেড়ে নিই। আমার হাতের টানে প্লাগ খুলে আসে। গান বন্ধ হয়ে যায়।

নিচে মেজভাই চিৎকার করে উঠে।

'গুন্ডামি ? আমার বাড়িতে গুন্ডামি ? আমি মুক্তিযোদ্ধা, একাত্তরে যুদ্ধ করেছি, দেশ স্বাধীন করেছি, আমার বাড়িতে হামলা ? আমি তোমাদের চিনি। তোমাদের বাপকেও চিনি। আমি ছাড়ব না। আমি ফকির হয়ে যাব, সব কটাকে একস্‌পোজ করে দেব। আমি ফাঁসিতে ঝুলব, সব কটাকে গুলি করে মেরে রেখে যাব।'

অবিশ্রান্ত চিৎকার করে চলে মেজভাই। উঠোনের মাঝখানে। নেচে নেচে। তর্জনী তুলে। ঘুরে ঘুরে। কিন্তু কেউ কান দেয় না।

কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না।

হুড় হুড় করে ঠেলা গাড়ি নিয়ে ডেকোরেটরের লোকজন আসে। বাঁশ আসে। দড়ি আসে। সামিয়ানার বস্তা আসে। হাঁড়ি আসে। ডেকচি আসে। থৈ থৈ করতে থাকে আমাদের উঠোন, বাড়ি, বারান্দা। চারদিকে বাঁশ পোঁতা হয়ে যায়। সামিয়ানার কাপড় টানানো হতে থাকে। ও পাশে গর্ত খুড়ে রান্নার জায়গা তৈরি হয়ে যায়। যুবকেরা কেতলি থেকে ঢেলে ঢেলে চা খায়। রঙ চা। অথবা রঙ চা নয়।

আমার হঠাৎ চোখে পড়ে। আমি সর্বস্বান্ত বোধ করি। বৈঠকখানার যে জায়গায় আমাদের বড়ভাই রাজাকারদের গুলিতে পড়ে গিয়েছিল, সেখানে বড়বু একটা ছোট জলচৌকির ওপর মায়ের জায়নামাজ খানা পেতে রেখেছিল। ঐ জায়নামাজে বসে হাফেজ সাহেব কোরান পড়ে আমাদের পরিবারের একজনের মৃত্যু বার্ষিকীতে। আমাদের পরিবারের প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঐ জায়গাটা। বাবা, যিনি মুখের ওপর কথা বলতেন, কাউকে পরোয়া করতেন না, সত্যি কথা বলতে ভয় পেতেন না, তাই যাঁর চাকুরিতে উন্নতি হয়নি, তার মৃত্যু। বড়ভাই, যিনি রাজাকারদের কাছে নত হননি, যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র রাখতেন লুকিয়ে এই বাড়িতেই, প্রাণ দিয়েছে কিন্তু তা প্রকাশ করেননি, তার মৃত্যু। বড় দুলাভাই, যিনি মাথা হেঁট করে বেঁচে থাকার চেয়ে মাথা উঁচু রেখে মরে যাওয়া অনেক ভালো মনে করতেন; মিলিটারি যাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেননি, তার মৃত্যু। আমাদের মা, মায়ের কথা কি সন্তানের মুখে কখনো শেষ হয় ?- সেই মায়ের মৃত্যু।

চোখের সমুখে সব কেমন ধোয়াটে বলে আমার বোধহয়। কানের ভেতরে, আশ্চর্য, আর কিছু শুনতে পাই না, কোথা থেকে কেবল কয়েকটা শালিকের কিচিরমিচির। আমি বাতাসে আমার দুহাত ঝাড়া দিই, নিজেই নিজের ঘাড়ের পেছনে থাবড়া দিই, চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে নেবো কিনা ইতঃস্তত করি।

কে একজন হা হা করে হেসে ওঠে।

সেই হাসিটা হঠাৎ সব ফোকাসে এনে দিয়ে যায়। আমি দেখতে পাই, জলচৌকির ওপর জায়নামাজটি নেই। আমার মায়ের জায়নামাজ। তার নিজের হাতে সেলাই করা। নিজের হাতে নকশা করা। লাল নীল সুতোয় তোলা। মাঝখানে গম্বুজ, দু'পাশে মিনার।

একটি মিনার ছোট হয়ে গেছে আরেকটির তুলনায়। বোধহয় সেই খর্বতা ঢাকতে সেখানে মা দিয়েছেন চাঁদ এবং তারা। আমি দেখতে পাই, জায়নামাজটি দলা পাকিয়ে এক কোণে পড়ে আছে। কেউ হয়ত ছুঁড়ে ফেলেছে। কিম্বা উড়ে গেছে বাতাসে, তারপর পায়ে পায়ে এক-কোণে। আসলে, এখনো আমি ভাবতে পারছি না যে জায়নামাজ কেউ নোংরা কাপড়ের মতো দলা পাকিয়ে দূরে ফেলে দিতে পারে। আমি দেখতে পাই, খালি জলচৌকিটার ওপর দু'টি যুবক বসে আছে। তারা সিগারেট টানছে। তাদের সিগারেট থেকে তীব্র একটা গন্ধ আসছে। ইব্রাহিমের কাছে এ গন্ধ আমি চিনেছিলাম। গাঁজা! আমার সন্দেহ থাকে না।

আমি যুবক দু'টিকে কিছুই বলতে পারি না। এমনকি, কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে জায়নামাজটিকে যে তুলব, তাও পারি না। আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

আমি বৈঠকখানার দরোজায় মূর্তির মতো দাড়িয়ে থাকি। আমি চোখ ফিরিয়ে নেবার কথা ভুলে যাই। সম্মোহিতের মতো যুবক দু'টির গাঁজা টানা আমি দেখতে থাকি। ঠিক ঐ জায়গাটিতেই বড় ভাই গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছিল।

আমি অবাক হয়ে যাই। আমি দ্রুত ভাবতে থাকি। কেন আমি যুবক দু'টিকে কিছু বলতে পারছি না? কেন আমি এই বাড়িতে চড়াওকারী কাউকে কিছুই বলতে পারছি না?

আজ দুপুরে, দুপুরেই তো। সুলতান মোহাম্মদকে তো বলতে পেরেছি।

সুলতান ছিল একা, এরা অনেক। তাই কি আমি সাহস পাচ্ছি না?

সুলতান জীবিতকে অপমান করেছে, এরা মৃতকে। তাই কি আমি উদাসীন এখানে এবং সক্রিয় ওখানে?

মেজবুকে চোখে দেখা যায় মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস হচ্ছে বিমূর্ত। সমস্যা কি এখানেই?

নাকি, সুলতান যে অপরাধ করেছে তা ব্যক্তির প্রতি, আর এদের অপরাধ সমষ্টির প্রতি। তাই আমার একার সাধ্য নয় এদের মোকাবেলা করি। তাই কি আমি চুপ করে আছি।

আমি উঠোনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াই।

উঠোন আর চিনতে পারি না। মাথার ওপরে সামিয়ানা উঠে গেছে। আকাশ একটুও আর দেখা যাচ্ছে না। দিনের আলো ঘোলা হয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। সামিয়ানার নিচে মানুষগুলো চলাচল করছে। কিন্তু তাদের কোনো ছায়া মাটিতে পড়ছে না। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। আমি থাম ধরে দাঁড়াই।

আমি মনে মনে মেজভাইকে খুঁজি। আমি ব্যাকুল চোখে চারদিকে মেজভাইকে খুঁজি। তাকে দেখি না। তার সাড়া পাই না। তার ঘরের দিকে তাকাই। ঘরের দরোজা খোলা। ঘরের ভেতরে মেজ-ভাইয়ের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে একটি যুবক। তার কোমরের কাছে একটি মেয়ে। যুবক মেয়েটির বেণী ধরে টানছে। মেয়েটি যুবকের বুকের উপর ঝুকে পড়ছে, আবার ঝট করে নিজেকে ছাড়িয়ে তুলে নিচ্ছে। আমার পিপাসা পায়। আমি রান্না ঘরে যাই। দেখি, এক যুবক চ্যাপটা শিশি থেকে খুব হিসেব করে মদ ঢালছে গেলাশে। খুব সাবধানে। আমি সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকি। যুবকটি শিশি বন্ধ করে ট্রাউজারের হাঁটুর কাছে একটা পকেট খোলে। শিশিটা সেখানে ঢুকিয়ে দিয়ে চেন টেনে দেয়। নিঃশব্দে সেখান থেকে আমি সরে আসি।

মেজবু নেমে আসে। সিঁড়ির পায়ের কাছে আমাদের দেখা হয়। আমি হঠাৎ তাকে অপরিচিত এক ভদ্র মহিলা বলে ঠাওর করি।

মেজবুকে মেজবু বলে চিনে উঠতে আমার একটু সময় লাগে। আমাকে ধাক্কা দিয়ে এক যুবক এপাশ থেকে ওপাশ চলে যায়। এখন আমিও আর কিছু মনে করছি না। এভাবেই বোধহয় সব কিছু একদিন স্বাভাবিক হয়ে আসে। মেজবুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসি। নিঃশব্দে। হাসিটা চড় চড় করে। যেন মুখোশ।

মেজবু বলে, 'সব ঠিক আছে। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। মিঠু এদের সবাইকে চেনে। ওদেরই সব বন্ধুবান্ধব।'

ঠিক। মেজবু ঠিক বলেছে। অচেনা আর কে? সবাই চেনা। সবাই বন্ধুবান্ধব।

'কিরে, কথা বলছিস না

আমি সামান্য একটু নড়ে চড়ে দাঁড়াই মাত্র। কথা আসে না।

'কিছু খাবি? ওদের জন্যে কফি করতে যাচ্ছি আমি।'

মাথা নাড়ি। না-সূচক। মেজবু কাঁধ তুলে একটা ছোট ঝাঁকুনি

দিয়ে যার অর্থ 'কি জানি, বাবা,' চলে যায়। আমি আগে কখনো এমন স্মার্ট ভঙ্গী করতে মেজবুকে দেখিনি।

ও পারে। ও পারবে। ও-ই বোধহয় পারবে। নাভির নিচে কাপড় পরতে পারে। মাথায় কাপড় দিয়ে হুজুরের কাছে যেতে পারে। বরের জন্যে জীবন চলে যায়। আবার ভাগনির বর দেখে লোভ হয় না। তা নয়। আর কত বলব? থাক। বোন তো। আমারই বোন। বাংলাদেশে আপন ছাড়া আর কে? সবাই আপন। শত্রু মিত্র, ভালো মন্দ, চোর সাধু, সবাই।

এতসব ভাবছি, মেজভাইকে খোঁজার কিন্তু বিরাম নেই আমার। গেল কোথায়? আমি খুব একটা খুঁজতেও সাহস পাই না। কি জানি কি চোখে পড়ে। আমি এক জায়গাতে দাঁড়িয়েই চোখ চালাই।

আমার কাছে সব গোলমেলে লাগে। যে লোকটা নিজেই বলে, তার আশাবাদ কিছুতেই মচকাবে না, সেই লোকটি কি পালিয়ে গেল? শেষ পর্যন্ত তাকেও পালাতে হয়?

'যান, যান, দেখা আছে।' এই জাতীয় একটা সংলাপ, একটা ঝগড়া কোথায় শুরু হয়ে যায়। মনে হয় করমচা গাছের নিচে, ওদিক-টায়। ওখানে আমাদের সবগুলো লাশ গোসল করানো হয়, ওখানে বাবুর্চিরা এখন মুরগী ছিলে ছিলে ডাঁই করে রাখছে। মাছি ভনভন করে উড়ছে। নীল মাছি।

অনেক রাতে বড়বুকে আমি ডাক দিই। ফিসফিস করে।

আর কিছু বলতে হয় না। বড়বু উঠে আসে।

রাত হয়েছে। কিন্তু চারদিকে চলাচল কোলাহল দিনের মতোই। কয়েকজন যুবক চলে গেছে, নতুন কয়েকজন এসেছে। মেয়েরা কয়েক-জন মোটর সাইকেলের পেছনে বসে কোথা থেকে ঘুরে এসেছে। আমার মেজবু ম্যাকসি পরেছে।

বড়বু একবার শুধু জিজ্ঞেস করে আমাকে, 'মনোয়ার?'

আমি মাথা নাড়ি।

তখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বড়বু। চৌকির কোণ ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকে চুপ করে। তারপর ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। একবার ভাবি, মিঠুয়ার সঙ্গে সেই যে দুপুর বেলায় দেখা আর দেখিনি। এখন একবার? বড়বুর মুখের দিকে তাকাই। বড়বু কি এক অনুচ্চারিত সংলাপের উত্তরে মাথা নাড়ে। না সূচক। আমি

বুঝতে পারি না।

উঠোনে গোল হয়ে বসেছে যুবকেরা। ঠোঙা ছিঁড়ে পরোটা কাবাব খাচ্ছে। দু'টি মেয়ে হাঁটু গেড়ে মাঝখানে বসে পরিবেশন করছে। আমরা তাদের দেখি। তারাও আমাদের দ্যাখে। কিন্তু কেউ যেন আমরা দেখছি না।

দুই ভাই বোনে নিঃশব্দে আমরা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসি।

১৪

নদী পেরিয়ে আমাদের দেশ। নদীর পাড়ে একটা হোটেল খুঁজে নিই আমরা। আমাদের আর কোনো বাড়ি নেই। বড়বুকে বারবার বলি হাত মুখ ধুয়ে নিতে, কিছু খেয়ে নিতে। না। সে বসে থাকে। সে ভাঙা চৌকির ওপর ময়লা চাদরের প্রান্তে মলিন হয়ে বসে থাকে।

আমি ভাঙা টেবিলের পাশে নড়বড়ে চেয়ারে বসি। দু'হাতে মুখ ঢেকে।

বাইরে মাঝরাতের নদী ছল ছলাৎ শব্দ করে ওঠে থেকে থেকে। হঠাৎ হঠাৎ কি যেন এ কটা কথা তার মনে পড়ে যায়।

বুড়িগঙ্গা নিয়ে কতদিন ভেবেছি একটি কবিতা লিখব। দীর্ঘ একটি কবিতা। দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস পড়ে আমার। কবিতা লেখা তাই ছেড়ে দিয়েছি কবে।

আমার নিঃশ্বাসের শব্দে বোধহয় জীবন ফিরে পায় বড়বু।

বলে, 'নে, শুয়ে পড়।'

'হ্যাঁ, বড়বু। শোবো।'

আমি চোখ থেকে কালো চশমা খুলে রাখি। মাথা থেকে ধীরে ধীরে পরচুলা খুলে টেবিলের ওপর নামাই। বাঁ চোখে ছোট্ট একটা চাপ দিয়ে পাথরের চোখটা বের করে সাবধানে আমি রেখে দিই। যেন ওটা আসল চোখ। যত্ন না নিলে আর দেখতে পাবো না।

'আয়।'

আমি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি। আবার মনে পড়ে, বুড়িগঙ্গার ওপর

দীর্ঘ একটি কবিতা। আবার মনে পড়ে, ইউনিভার্সিটিতে হরতালের সেই দিনটি। আমাদের মিছিলের ওপর হামলা। ওদের দুটো মোটর সাইকেল আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। ওরা বোমা ছোঁড়ে। আমার বাঁ চোখ নষ্ট হয়ে যায়। আমি পড়ে যাই। তরল কি একটা আমার মাথায় এসে পড়ে। আমার সমস্ত চুল পুড়ে যায়। বুড়িগঙ্গার ওপর কবিতাটির প্রথম লাইনটিই কেবল তৈরি করেছিলাম। বও, ধীরে বও, বুড়িগঙ্গা, তোমাকে মিনতি করি, ধীরে বও তুমি। কেন তাকে ধীরে বইতে বলেছিলাম, আজ আর মনে পড়ে না। কি আমার প্রয়োজন আছে নদীর দেশে নদীর সাথে যে, নদীকে আমি ধীর হতে বলি, আমি ভেবে পাই না।

বড়বু আমার মাথার কাছে বসে চোখে মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ঠিক যেমন মিঠুরা দিত।

টেবিলের ওপর পাথরের চোখ আমাদের সমস্ত কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

মার্চ ১৯৮৬
মঞ্জুবাড়ি গুলশান ঢাকা।